কুমারেশ ঘোষের হাসির গল্প

কুমারেশ ঘোষ

AKS

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

উপহার

সূচীপত্র

মাছ ধরার গল্প

আমরা ক'জন ঠিক করলাম, মাছ ধরতে যাবো।

কিন্তু সুবিধেমত পুকুর একটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কলকাতার কাছাকাছি তো কোনো পুকুরই নেই আর। যা জমির দর! তাই পুকুরগুলোকে ভরাট করে সেগুলো বিক্রী করে দিচ্চে চড়াদামে আর ক'দিন বাদেই চড়চড় করে উঠচে বাড়ির চূড়ো।

কাজেই আজ যেখানে জল, কাল সেখানে ভাড়াটে ধরবার জাল। মাছ ধরবার জাল বা ছিপ ফেলবার জায়গা কোথায়?

হঠাৎ খেয়াল হ'লো, বেলঘোরে-তে স্যাণ্ডাদের একটা বাগান আছে আর একটা বড় পুকুরও আছে সেখানে। স্যাণ্ডা আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। ছোটবেলায় হাফ প্যাণ্ট পরে রাস্তায় ড্যাং-গুলি আর মাবেলগুলি খেলেচি, স্কুলে গিয়েচি, ফুটবল খেলেচি, ঘুড়ি উড়িয়েচি। আরো বড় হ'লে ফুলপ্যাণ্ট করিয়েচি একই রকম কাপড়ে এবং একই দর্জির দোকানে; আর সেই ফুলপ্যাণ্ট পরে 'ফুলবাবু' নয়, ফুল সাহেব সেজে কোথায় না গেচি: চাকরির খোঁজে, খেলার মাঠে, সিনেমার লাইনে— বহু জায়গায়। সেই স্যাণ্ডা! এখন না হয় কাজের চাপে দু'জনে দু'দিকে ছিটকে গেচি!

তবে মনে আছে, স্যাণ্ডার একটা বড় দোষ ছিল 'হাই-হাই টক' করার। এখনো আছে কিনা কে জানে!

যাক্, আমার ওপর ভার পড়লো স্যাণ্ডাকে ধ'রে তাদের পুকুরের ব্যবস্থাটা করা। ন্যাড়া, ভুতো, নন্তে সবাই আমাকে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠালো: যা ভাই, তুই বললেই হবে। তোর কথা সে

ফেলতে পারবে না। আর আমরা তো পুকুর-চুরি করতে যাবো না, যাবো মাছ ধরতে শুধু!

ন্যাড়া বাধা দিলে। বললে, মাছ ধরতে দেওয়াটা আজকাল কম নাকি? জানিস্‌নে বাজারে মাছের দর? কাটা-পোনা সাত-আট—

শুনে ভুতো ধাক্কা দিলে, তুই থাম্ তো, এখন এলো বাজার দর শোনাতে!

নন্তে বললে, যা বলেচিস্! বন্ধুর জন্যে বন্ধু প্রাণ দেয়, আর নিজের পুকুরে হু'টো মাছ ধরতে দেবে—এ আর এমন কি কথা! —আমাকে ঠেলে দিয়ে বললে, তুই আর এদের তত্ত্বকথা শুনিস্‌নে ডাইরে ডাঁইরে। সোজা বেলঘোরে থেকে কাজটা বাগিয়ে ঘুরে আয়। তোর স্যাণ্ডাকে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে সব বুঝিয়ে বলবি! বুঝ্‌লি?

ভুতো বললে, আর এ-ও বলিস্, মাছও বিদ্যের মত, যতই করবে দান তত যাবে বেড়ে!

ন্যাড়া হেসে বললে, হ্যাঁ, তাই বলিস্। তোর বন্ধু যদি ঘাস খায় তো তাই বুঝবে!

শুনে ভুতো বললে, দ্যাখ, এ-সংসারে ঠিক বোঝাতে পারলে কাঁচা ঘুঁটিও পেকে যায়। নইলে পাকা ঘুঁটিও যায় কেঁচে! তুই আর ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিস্ নে বাপু! শুভযাত্রায় অমন বাধা দিতে নেই।

যা বলেচিস্—বললাম আমি: আমার ঘটেও তো যা হোক একটু আছে—তাই দিয়ে দেখি কী করতে পারি।

এবং আর দেরি না করে 'হুগ্‌গা শ্রীহরি সিদ্ধিদাতা গণেশে'র নাম স্মরণ করে রওনা হলাম বেলঘোরে। পাঁজি না দেখলেও,

বোধকরি শুভলগ্নেই শুভযাত্রাটি হয়েছিল, কারণ গিয়ে শুনি স্যাণ্ডার চাকরিতে প্রমোশন হয়েচে, মাইনে বেড়েচে তার। মেজাজটা দেখালাম বেশ ফুরফুরে। যেতেই আদর-আপ্যায়ন, চা-জলখাবার ইত্যাদি জুটে গেল এবং শেষে স্যাণ্ডা বললে, ওঃ, তুই যে মনে করে এসেচিস, তাতে যে কী আনন্দ হচ্চে, কী বলবো! যাক্ বন্ধুর কথা মনে আছে তা হ'লে!

এতক্ষণ স্যাণ্ডার কথার ফুলঝুরি আর আদর-যত্নের ঘটাঘটিতে আসল কথাটি বলবার সুযোগ পাইনি। এবার হেসে বললাম, ভাই, সত্যি কথা বলতে কি, তোর নয়, তোর পুকুরের কথা মনে পড়তেই এলাম।

তার মানে?—স্যাণ্ডা জিগ্যেস করলো।

মানেটা বুঝিয়ে দিলাম সবিস্তারে এবং সব শুনে স্যাণ্ডা বললে, তুই, তোর বন্ধুরা মাছ ধরতে আসবি, এ তো আমাদের পুকুরের ভাগ্য! মাছের ভাগ্য, আমাদের ভাগ্য তো বটেই!

খুব খুশি হয়ে জিগ্যেস করলাম, তুই পুকুরে মাছটাছ ধরিস্‌নে!

ধরবার দরকার হয় না।—স্যাণ্ডা বললে, পুকুরে মাছ গিজগিজ করচে। রোজ সকালে উঠে দাঁতন করতে করতে পুকুরে দু'একটি ঢিল ছুঁড়ি—তাতেই দু'তিনটি মাছ জাল থেকে লাফিয়ে উঠে আছড়ে পড়ে রান্নাঘরের বারান্দায়। সেগুলোকে কেটে-কুটে সঙ্গে সঙ্গে কড়াইয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়!

বুঝলাম, স্যাণ্ডার সেই ছোটবেলাকার বড় বড় কথা বলবার, মানে, 'হাই-হাই-টক'-এর অভ্যাসটা এখনো ঠিক যায়নি। তবে কাজ গোছাতে এসে বৃথা তর্ক করার কোন মানে হয় না। তাতে ঐযে—পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবারই সম্ভাবনা। তাই শুধু হেসে বললাম, বাঃ, বেশ তো! একদম টি-গার্ডেন টু টি-পট!

তা যা বলেচিস্।—স্যাণ্ডা বললেঃ তবে হ্যাঁ, তোরা তো সব মাছগুলোর কাছে অচেনা, মানে নতুন লোক! কাজেই মাছ ধরবার চার কিন্তু সঙ্গে আনতে ভুলিস্‌নে! ভাল ভাল মাছকে খাবারের 'চার' দিয়ে লোভ না দেখালে—মানে কলকাতার শহরতলীর মাছ কিনা—ভারি চালাক!

আমি বললাম, তা তোরা ঢিল ছুঁড়লে মাছগুলো বোকার মত উঠে আসে কেন?

ঐ তো মজা! - স্যাণ্ডা বললে, প্রাণের ভয়ে উঠে আসে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের কপালে যা ঘটে সে খবরটা তো আর তারা ফিরে গিয়ে জানাতে পারে না আর সবাইকে। আর পুকুরের তলায় কোন খবরের কাগজও নেই!

বললাম, তা বটে!

স্যাণ্ডা বললে, শোন্ তবে, কেন 'চার' আনতে বললাম। একবার এক পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে আমি প্রায় বেইজ্জত হয়ে গেছলাম আর কি!

কি রকম?—জিগ্যেস করলাম উৎসুক হয়েই।

স্যাণ্ডা বললে, সে এক মজার ব্যাপার। তখন আমাদের এই বাড়ি পুকুর বাগান কিছুই হয়নি। দেশে এক পুকুরে মাছ ধরতে গেছি। কিন্তু তাড়াতাড়িতে মাছের 'চার' নিয়ে যেতেই গেচি ভুলে। প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে সেই পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে দেখি—মা থলেতে 'চার' ভ'রে দিতে ভুলে গেচে, শুধু খাওয়ার জন্যে চিঁড়ে, গুড়, কলা ভ'রে দিয়েচে আর একটি শিশিতে করে দুধ। বোঝ্ তখন ব্যাপারটা!

ইস্। সত্যিই তো!—বললাম আমি।

অথচ দু'দিন ধরে 'চার' তৈরী করেচি কত কষ্ট করে আর সেই

'চার!'—স্যাণ্ডা হাত নেড়ে বললে, আমার মেজাজই গেল খারাপ হয়ে। ধেত্তেরি! চিঁড়ে-গুড় তো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে; ক'টা কলা আর দুধটাও ফেলতে যাবো, এমন সময় সামনে দেখি একটা জাত সাপ, কেউটে! তার মুখে একটা ব্যাং! বুঝ্লি, একেই বলে, যে খায় চিনি, তাকে জোগায় চিন্তামণি!···আমি তখনি তাকে 'তু-তু' করে ডাকতেই সে কাছে সরে এলো!

তোর ভয় করলো না?—আমিই ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম।

ভয়!—স্যাণ্ডা বললেঃ তখন মাথায় ভাবনা, কি করে মাছ ধরি! বরং ভাবনা হ'লো, ব্যাংটাকে কি করে হাত করা যায়!··· হ্যাঁ, বুদ্ধি এসে গেল। ঐ দুধ আর কলা সাপটার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, নে, খা, খা। তোর জন্যে এনেচি।- কিন্তু সাপটা মুখে ব্যাং ধরে ফণা উঁচু করে গুম্ হয়ে রইলো। আমি বুঝলাম, সাপটা ভাবচে, ব্যাংটা খাবে, না, দুধ-কলা খাবে।···আমি তখন সাধতে লাগলাম, কী? অত ভাবচো কী? নাও, খেয়ে নাও। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার! আচ্ছা, আমি দেখবো না, এই চোখ বুজে আছি। চোখ বুজে বলতে লাগলাম, কে খায়, কে খায়? আমার সোনামণি খায়, না, কাক এসে খায়!

তাড়াতাড়ি বললাম, কী সাহস রে তোর! চোখ বুজে থাকলি, যদি কামড়ে দিতো!

আঃ, শোন্ না আগে!—স্যাণ্ডা বললে, আমি মিটমিট করে দেখতে লাগলাম। দেখি, সাপটা আমার দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে মুখের ব্যাংটাকে ছেড়ে দিয়ে ফণাগুটিয়ে আমার দুধের শিশিতে মুখ দিলো। কলা দুটোও গপ্‌গপ করে খেয়ে নিলো। তারপর চলে গেল, বোধহয় দিবানিদ্রা দিতে! আর আমি তখন পকেট থেকে ছুরি বার করে ব্যাংটাকে কেটে-কুটে বঁড়শির মুখে

লাগিয়ে—বুঝ্‌লি টপাটপ মাছ ধরতে লাগলাম! ওঃ, আধঘণ্টায় প্রায় মণ দুই মাছ ধরে হঠাৎ খেয়াল হ'লো, অত মাছ বয়ে নিয়ে যাবো কেমন করে!

আহা, আমি যদি থাকতাম!—বলেই ফেললাম!

স্যাণ্ডা বললে, থাকলেও কি মাছ ধরা পর্যন্ত জ্ঞান থাকতো তোর! ঐ সাপ দেখেই তো—

তা বটে!—স্বীকার করলাম।

স্যাণ্ডা বললে, কী আর করি! অত মাছ তো একলার পক্ষে—কাজেই প্রায় দেড়মণ মাছ আবার ঠেলে পুকুরে ফেলে দিয়ে আধ মণ খানেক বেঁধে-বুঁধে নিয়ে উঠতে যাবো, হঠাৎ শুনি পিছনে হিস-হিস শব্দ! দেখি সেই সাপটা! এবার দেখি ব্যাটার মুখে দুটো ব্যাং। দুধ-কলার লোভে আমাকে ঘুষ দিতে এসেচে!··· আমার তখন আর ব্যাংয়ের কি দরকার! যেন দেখতে পাইনি ভাব করে উঠে যাচ্ছিলাম, দেখি ব্যাটা আমার পেছনে পেছনে আস্‌চে! দেখে রাগ হয়ে গেল। আচ্ছা হ্যাংলা তো! আমি হাতের মাছগুলো মাটিতে রেখে—সাপটির গালে ঠাস্ করে এক চড় বসালাম। চড় বসাতেই তার মুখের ব্যাং দুটো গেল ছিটকে। আর হিস্ হিস্ নয়, 'ইস্' করে উঠলো সাপটা। দেখি, তার দু'চোখে জল! আমি আবার কারোর চোখে জল দেখতে পারিনে। তাই তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মাছগুলো তুলে চলে এলাম বাড়ি!

সব শুনে, আমি আর না জিগ্যেস করে পারলাম না : আচ্ছা, সাপটা না হয় ব্যথার চোটে 'ইস' করে উঠলো, কিন্তু দু'দুটো ব্যাং মুখে হিস্-হিস্ করছিল কি করে?

শুনে স্যাণ্ডা গম্ভীর হয়ে বললে, ঐ তোর দোষ। সেই

ছোটবেলাকার দোষ। সব কিছুতেই জেরা করা। একি কোর্ট-কাছারি পেয়েছিস্ ? গপ্পো ইজ গপ্পো। জেরা করতে নেই !.

এ গল্প আমার বন্ধুদের কাছে করিনি। এবং মাছ ধরবার 'চার' যাতে ভুলে না যাই—তাই শিয়ালদার বাজার থেকে ভাল 'চার' কিনে নিয়ে থলে ভর্তি করে আমরা স্যাণ্ডাদের পুকুরে পরদিন মাছ ধরতে গেলাম এবং বিকেলবেলা ফেরবার সময় শ্যামবাজার থেকে প্রত্যেকেই একটা দু'টো মাছ কিনে বাড়ি ফিরতে হ'লো ! বাড়িতে মুখ দেখাতে হবে তো !

ন্যাড়াটা বড় বোকা। বাজারে গিয়ে বলে, টাটকা ইলিশ কেন্ !

ধমক দিয়ে বললাম, শহুরে ছোকরা তুমি, তাই ভাবো ধানগাছে তক্তা হয়। বাড়ি গিয়ে পুকুরের ইলিশ বলতে গেলেই—ব্যাস্ ! বুঝলি ?

পৈতৃক সম্পত্তি

এক ধরনের ছেলে আছে—যাদের কাজই হচ্চে পরের খবরা-খবর নেওয়া, মানে পরের হাড়ির খবর নেওয়া। পরের খবরাখবর নেওয়া বা পরের ব্যাপারে নাক গলানো খুবই বিশ্রী অভ্যেস! বদ অভ্যেস!

এই রকম বদ অভ্যেস ছিল আমাদের গড়পারের বিশ্বনাথের— বা বিশের। বিশে না তো, বিছে! কথার ফাঁকে ফাঁকে এমন সে কুটুস-কুটুস কামড়াতো যে, মন জ্বলে যেতো, গা জ্বালা করতো! কথায় তার এমনি বিষ!

তবে দোষে-গুণে মানুষ। বিশের গুণও ছিল। কারোর বিপদ দেখলে সে ঝাঁপিয়ে পড়তো! কারোর অসুখ হয়েচে? ডাক বিশেকে। ছুটলো বিশে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, রাত জেগে সেবা করা--সব কিছুই বিশে নিজের ঘাড়ে নিতো। যেন তারই দায়! তাছাড়া পাড়ার পাঁচীঠাক্‌রুণের রেশন আনবার লোক নেই—ক্ষতি নেই—বিশে আছে তো। রেশনের থলে হাতে নিয়ে লাইনে ছুটলো সে! আবার হয়তো বিশে পাড়ার গলি দিয়ে একটা সিনেমার গানের প্রথম লাইনটা ভাঁজতে-ভাঁজতে চলেচে—(কারণ, ঐ একটা লাইনের কথা আর সুরই তার মনে থাকতো)—এমন সময়, উপরের বারান্দা থেকে হয়তো চাপা গলায় ডাক দিলেন পাড়ার পরেশদার স্ত্রী:

বিশু ভাই, শুনবে একটু?

যাই বৌদি! বলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির এক এক সিঁড়ি বাদ দিয়ে লাফিয়ে উঠে ভদ্রমহিলার সামনে উপস্থিত! তারপর হয়তো

থিয়েটারী ঢংয়ে বললে, দেবর লক্ষ্মণ তব রয়েচে সম্মুখে, করো আজ্ঞা দেবি, কাহার মুণ্ডু আজি আনিব ছিঁড়িয়া ?

ভদ্রমহিলা হয়তো হেসে বললেন, মুণ্ডু না, মণ্ডা আনতে হবে।

মণ্ডা !

হ্যাঁ। ভদ্রমহিলা কাতর হয়ে পড়েন : দেখো না ভাই, বাড়িতে কেউ নেই, তোমার দাদাও নেই—অথচ দু'তিনজন কুটুমবাড়ির লোক এসে পড়েচেন। কাকে দিয়ে যে একটু—

মাই ঘ্যাড্ ! এই ব্যাপার ! দিন পয়সা !

ভদ্রমহিলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আঁচল খুলে পয়সা বার ক'রে —কি কি ক'টা আনতে হবে বুঝিয়ে দিতেই তর্-তর্ করে নেমে গেল বিশে। এবং সে রাস্তায় পড়তেই শোনা গেল ঐ সরুগলি দিয়ে ফুলস্পীডে একখানা মোটর গাড়ী বেরিয়ে যাচ্চে ! না, না,—বিশে মুখে 'পিঁ-পিঁ' শব্দ করতে করতে—সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেচে—পাঁচ মাথার মোড়ে ঐ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দিকে ! মিনিট পাঁচ-সাত পরেই আবার সেই দ্বিপদ মোটরখানা 'পিঁ-পিঁ' শব্দ করতে করতে—সোজা পরেশবাবুর বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়ে মাল ডেলিভারী দিয়ে দিলো :

বিশু, এই নাও একটা রসগোল্লা !

শুনে বিশে প্রায় আঁতকে ওঠে : রসগোল্লা ! বাপস্ ! স্কুলের ছেলেদের ওসব খেতে নেই একদম।—খেলেই পরীক্ষার খাতাতেও ঐ রসগোল্লা খাওয়া অভ্যেস হয়ে যায় !

তবে সন্দেশ !

উঁহু ! সন্দেশ—খবরের কাগজওলাদের একচেটিয়া খাদ্য !

কেন ? কেন ?

বিশে হেসে বলে, জানেন না বুঝি ? সন্দেশ মানে সংবাদ !

আচ্ছা, তা হলে সিঙাড়া ? —ভদ্রমহিলা কিছুতেই ছাড়বেন না।

উঁহু বৌদি ! ওতো তৈরী-গরম ! ওর চাইতে নিজে হাতে লুচির মধ্যে তরকারি ভরে কামড় দেওয়াই তো ঢের ভালো !—আচ্ছা, আসি বৌদি। আরে ভোয়া !

আরে, আরে, কি বল্লে ?

ফরাসী ভাষায়, বিদায় !—কথাটা বিশে নতুন শিখেছিল পাড়ার পল্টুর কাছে—তাল বুঝে চালিয়ে দিয়ে একেবারে হাওয়া !

ক্লাসে বিশে যে খুব একটা ভাল ছেলে, তা নয়। এলজাব্রার পাঁচটা অংক কষলে- তার মধ্যে প্রায় সাড়ে-তিনটেই ভুল। অর্থাৎ তিনটে একদম ভুল, আর একটা হ'তে হ'তে শেষ মুখে 'ও যাঃ' হয়ে যায় ! তাছাড়া, ক্লাস এইটের ছেলে, এখন ইংরিজি লেখে—He goes নয় He go ; I have নয়, I has আর বানানের ব্যাপারে এমনি বুনো যে, কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই।

বুঝি সেইজন্যই ক্লাসের গুডবয় অমলেন্দু ঘোষ বা অমলুর সঙ্গে বিশের বেশ ভাব! আমি, সুধীর, অসিত সবাই অবশ্য সেজন্যে বিশেকে মিষ্টি-মিষ্টি শোনাতে ছাড়তাম না। হ্যাঁরে, অমলুর সঙ্গে তোর যে খুব ভাব দেখচি ! আমাদের সঙ্গে বাড়ি যাসনে ! ব্যাপার কি ?

সুধীরটা একটু হ্যাংলা। জিগ্যেস করলে, আলুকাবলি খাওয়ায় বুঝি ?

অসিত বললে, সিনেমা দেখিস্ বুঝি ওর পয়সায় ?

আমিও ঠুকতে যাচ্ছিলাম, ওর খাতা থেকে অংক টুকিস্ বুঝি ?—কিন্তু তার আগেই বিশে যে কারণ দেখালো তা রীতিমত আশ্চর্যের। বললে, ভাল সাবান গায়ে মাখলে গায়ে কেমন সুন্দর গন্ধ হয় দেখেছিস্ ! ঘামের গন্ধ একদম উবে যায়। তাই আমিও ওর পাশে

গা ঘেঁষে বসি,—যাতে গুডবয়ের ছোঁয়া লেগে ভাল হ'তে পারি! ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত যদি ছোঁয়াচে হ'তে পারে— তবে এলজাব্রা, ব্যাকরণই বা ছোঁয়াচে হবে না কেন?—কি বল্ রে অমলু! ঠিকই তো! এ কথাটা আমরা কেউই ভেবে দেখিনি! অতএব সেই থেকে আমরাও অমলুর আশে-পাশে ঘুরতে লাগলাম। মাস্টার অমলেন্দু ঘোষকে আমরা বুঝিয়ে দিলাম, বিদ্যে এমনই জিনিস যে, যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে। এবং সেই শুনে অমলু পরম উৎসাহে আমাদের বিদ্যে দান করতে লাগলো। অতএব আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম এবং ক্লাসের স্যারেব বক্‌বক্ করবার অবাধ স্বাধীনতায় কোন রকম হস্তক্ষেপ না করে পেছনের বেঞ্চে বসে নিজেদের মধ্যে বৃহত্তর ও মহত্তর আলোচনায় কালক্ষেপ করতে লাগলাম। সে সময়টায় কোথায় কোন্ সিনেমায় কি ছবি হচ্চে অথবা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল কে কাকে সেদিন ক' গোল দিতে দিতেও পারলো না, সে বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য বস্তু মস্তিষ্কে বোঝাই করতে লাগলাম। কারণ, আমাদের বেশ জানা ছিল, অমলু ততক্ষণে আমাদেরই হয়ে তার ঘটে ভরে নিচ্চে ক্লাসের তেতো অথচ পুষ্টিকর পাঁচন! অর্থাৎ পাখী-মা যেমন খাবার মুখে করে নিয়ে এসে তার বাচ্চাদের মুখে ভরে দেয়, তেমনি অমলু বিকেলে তার বাড়িতে আমাদের কানে—বোঝা unload করবে এবং সেই সঙ্গে চা-চানাচুর দিয়ে load করবে আমাদের পেটটাও। তবে অমলুর দেওয়া solid-টুকু পেটে রেখে বিদ্যের হাওয়া সব এ কানে নিয়ে ও কান দিয়ে বার করে দেওয়া-না-দেওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করতো নিজেদের খেয়াল-খুশির ওপর।

ঘটনাটা বলি।

মানে অমলুর সাজ-সজ্জার দিকে তেমন কোন নজর ছিল না। যা পেতো তাই পরতো। এসব ভাল ছেলেরই লক্ষণ!

তখন শীতকাল। একদিন দেখা গেল অমলু একটা ভাল ফ্লানেলের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে স্কুলে এসেচে। ক্লাসে বিশে যথারীতি তার পাশেই বসে ছিল, জামাটা বোধকরি লক্ষ্য করে দেখলো, সেটায় পুরোন সেলাই খোলার দাগ! এবং দেখামাত্রই তার মাথার পোকাগুলো কিলবিল করে উঠলো। জিগ্যেস করলো, এ জামাটা নোতুন কর্‌লি বুঝি!—সেই পরের হাঁড়ির খবর নেওয়া।

অমলু বললো, না পাঞ্জাবীটা বাবার ছিল, আমি কেটে ছোট করে নিয়েচি।

শুনে বিশে শুধু বললে—অ!

আর একদিন।

দেখা গেল অমলু একটা সার্জের কোট পরে এসেচে। বেশ দামী।

বিশের আবার সেই যথারীতি প্রশ্ন: বাঃ, বেশ কোট তো? নতুন করালি বুঝি?

অমলু বললো, এটাও বাবার ছিল, ছোট হয়ে গেছলো, তাই কাটিয়ে আমার মাপের করে নিয়েচি!

বাঃ, বেশ তো!—বিশে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, তোর বাবা বেঁচে থাকতেই দিব্যি তো পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করচিস্। বেড়ে আচিস্।

শুনেই অমলু কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। আমরা বেকায়দা বুঝে তাড়াতাড়ি ধমকে দিলাম বিশেকে: কী হচ্ছে ইয়ার্কি! ও যদি ওর বাবার জিনিস পরে, তো তোর চোখ টাটাবার কি আছে রে!

উত্তরে বিশে শুধু বললে, সরি, ভুল হয়ে গেচে।

আরো কয়েকদিন পর।

অমলু ক্লাসে এলো হাফপ্যান্ট পরে। অবশ্য হাফপ্যান্ট সে

পরতোই, তবে মনে হ'লো সেদিনের প্যাণ্টটা যেন এই প্রথম দেখলাম আমরা।

তবু কী দরকার আমাদের ওর প্যাণ্টের খবর নেবার! চুপচাপই ছিলাম, কিন্তু বিশে বাড়ি ফেরবার পথে জিগ্যেস করে বসলো, এটাও তোর বাবার ছিল নাকি রে?

সত্যিই ছিল হয়তো! তাই অমলুর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো। বললে, জানিনে যাও!

আহা বল্‌না?—বিশে অনুনয় করলে।

কিন্তু আশ্চর্য, অমলু নিজেই বললে, হ্যাঁ বলবো! আমি কি কারোর প্যাণ্ট চুরি করে পরেচি যে বলবো না? এটা আমার বাবার ফুলপ্যাণ্ট ছিলো, কেটে হাফপ্যাণ্ট করে নিয়েচি!

শুনেই হাসি চাপতে না পেরে সুধীর মুখে একটা বিশ্রী খুঁক-খুঁক আওয়াজ করে ফেললো। ব্যাস্, বিগড়ে গেলো অমলু। বললে, আমি চললাম, আমার তাড়াতাড়ি আছে। হনহন করে এগিয়ে গেলো সে।

নাও, হ'লো তো! বিকেলের চা-চানাচুর তো গেলই, এখন অংক সংস্কৃতটা না বুঝে নিলে আর ছু'দিন বাদেই বার্ষিক পরীক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে বড় বড় রাজভোগ আর বাড়িতে কানমলা খেতে হবে! নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারলাম! ঐ বিশেটা যত নষ্টের গোড়া!

কাজেই পরদিন অমলু ক্লাসে আসতেই, আমরা ঘন হয়ে তাকে ঘিরে ধরলাম, কত রকমের বিলাপ করলাম, প্রলাপ বকলাম, অনুতাপ করলাম নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে এবং বিশেকে যৎপরোনাস্তি হেনস্থা করতেও ভুল করলাম না। এরপর কোনো ভদ্রলোকই গরম হয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু ভিৎ নড়িয়ে দিলে সুইজারল্যাণ্ডের একটা রিস্টওয়াচ! কী কুক্ষণে জানিনে, অমলু চমৎকার একটা রিস্টওয়াচ পরে ক্লাসে এলো একদিন। আমরা দেখলাম, কিন্তু কিছুই বললাম না। কী দরকার! তবে লক্ষ্য করলাম, অমলু নিজেই উসখুস করচে। বারে বারে ঘড়ি দেখচে আর আড়চোখে আমাদের দেখচে।

টিফিনের সময় বিশে বললে, ছাখ্, ঘড়ির গল্প করবার জন্যে অমলু কিন্তু মুখিয়ে আছে।

বললাম, থাকগে, দরকার নেই ঘাঁটিয়ে।

সুধীর অসিতও ডিটো দিলে আমার কথায়।

কিন্তু দেখা গেল, অমলুই এগিয়ে এলো আমাদের কাছে। নিজের ঘড়িটা দেখে বললে, চ, ক্লাসে যাই। আর মিনিট খানেক সময় আছে বাকি।

হুম—সুধীর বললে।

অমলুই বললে, এতো চমৎকার সময় দেয় ঘড়িটা! তাছাড়া ঘড়িটায় দম দিতে হয় না, রাত্রে ডায়ালটা জ্বলতে থাকে—

—হুম্—এবার অসিত শব্দ করলে। কিন্তু দারুণ কৌতূহলে আমাদের পেট ফুলতে লাগলো।

তবে অমলু আর পারলে না থাকতে। বললে ঃ মামা বিলেত গেছলেন, আমার জন্যে এই ঘড়িটা—ব্যাস্!

সঙ্গে সঙ্গে বিশে গম্ভীর হয়ে দিলো এক কথার কামড় ঃ অ, তোর মামা এনে দিয়েচেন। আমি ভাবলাম, এটাও বুঝি তোর, মানে, তোর বাবার clock কেটে watch করে নিয়েচিস্।

হ্যাঁ, করেচি, বেশ করেচি! অমলু আর দাঁড়ালো না সেখানে।

দাদামশায়

আমার দাদামশায় খুব রাশভারি লোক ছিলেন।

লম্বা চওড়া মানুষটি। মোটা মোটা হাত-পা। বিরাট ভুঁড়ি, এক গোছা পাকা গোঁফ আর ছোট্ট করে ছাঁটা পাকা চুল! বাজ-খাই গলা আর চোখের দৃষ্টিটা যেন অন্তর্ভেদী!

মুখের দিকে চাইলে মনে হ'ত, এইরে, মনের সব খবরটাই বুঝি জেনে ফেললেন দাদামশায়!

কুষ্টিয়ার নাম করা উকিল। রাইচরণ দাসের নাম শুনলে ওদিকে গোয়ালন্দ থেকে এদিকে পোড়াদা পর্যন্ত সবাই একবাক্যে বলতো, হ্যাঁ, জব্বর উকিল, বটে! ওঁর হাঁকে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়।

সকালে কাছারি ঘরে সে কী ভিড়! মাঠের চাষী থেকে জমিদারের নায়েব পর্যন্ত সবাই যেন তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে! তাঁর মুখের একটু পরামর্শ, একটু ব্যবস্থা পেলেই তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে!

দাদামশায় সকালে যতক্ষণ মক্কেল ঘেরোয়া হয়ে থাকতেন, আমি ততক্ষণ সামনের দরজার চৌকাঠ মাড়াতাম না, পেছনের খিড়কির দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করতাম। বেলা আটটায় ছাতাটাকে কাঁধে করে তিনি নিজেই যখন বাজারে যেতেন এবং দশ মিনিটে প্রায় দশ রকমের জিনিস আর বিরাট দুটো ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে ফিরতেন, সেই ফাঁকটুকুতেই আমি একটু-আধটু দুষ্টুমি ক'রে নিতাম। তারপর দাদামশায় বাড়িতে ঢুকলেন, এই নাতিটিও একদম কেঁচো!

এক একদিন দাদামশায়ের কী খেয়াল হ'ত তিনি নিজেই হাঁটুর কাপড় উঠিয়ে আঁশবটি নিয়ে বসে যেতেন মাছ কুটতে। তখন

আমার উপর ভার পড়তো লাঠি নিয়ে দাঁড়াতে—মাটিতে বেড়াল আর আকাশের কাক-চিল তাড়াতে। আমি লাঠি নিয়ে, কেন যেন ভয়ে, কাঠির মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমার 'গোবেচারা' অবস্থা দেখে দিদিমা, মাসিমা, মা-রা মুখটিপে হাসতেন, আর রাগে সর্বাঙ্গ আমার জ্বলে যেতো।

আর জ্বলে যেতো বোধহয় কাছারি ঘরে বসে থাকা মক্কেলরা। কিন্তু সে রাগ তাদের হজম করতে হ'ত। কিন্তু আমি রাগ ঝালাতাম, দাদামশায় কাছারি গেলে। দাদামশায় দশটা নাগাদ মাথায় সরষের তেল ঘষতে ঘষতে, কাঁধে গামছাটা নিয়ে গরোই নদীতে গিয়ে গুণে তিনটে ডুব দিয়েই এসে বলতেন, ভাত দাও। তক্ষুণি তাঁকে উনুনে-চড়ানো হাঁড়ি থেকে হাতা কেটে ভাত দিতে হত, আর তিনি, আশ্চর্য, সেই ফেন সমেত গরম ভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে সপাসপ শেষ করতেন তাঁর খাওয়া মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যে। আমি লুকিয়ে দেখতাম তাঁর সেই অদ্ভুত খাওয়া!

তারপর বার হ'ত তাঁর সাদা প্যাণ্ট, যার ক্রীজের কোন বালাই ছিল না, আর কালো চাপকান, যার রং উঠে ফ্যাকাশে হয়ে গেচে—পুরোন উকিলের পাশপোর্ট। বেল্ট হাতের কাছে না পেলে গামছা বা শাড়ীর পাড় দিয়েই প্যাণ্টটা বেঁধে নিতেন আর খালি পা দু'টো ঢুকিয়ে নিতেন প্রায় আধমণি ওজনের জুতোর মধ্যে। মোজা পরবার সময় কোথায়?

অর্থাৎ সাজসজ্জা করতে আরও সময় লাগতো মিনিট পাঁচেক এবং আমার মনটা সেসময় নাচতো। কারণ ঐ ক'টা মিনিটের পরই বাড়িতে আমার রাজ্য! দাদামশায় চৌকাঠ পার হ'লেই মার-মার শব্দে সারা বাড়ি তোলপাড় করতাম আমি!

অথচ দাদামশায় যে বকতেন, তা নয়। বরং সন্ধ্যার সময়

আমাকে কাছে নিয়ে বসতেন আর তাঁর চারপাশে বসতেন দিদিমা, মাসিমা, মা আর সবাই। সারাদিন কি করলেন. তারই বিস্তৃত বিবরণ তিনি চমৎকার গল্প ক'রে বলতেন। উঠোনে মাতুরে বসে গল্প করতেন আর সবাই শুনতো তাঁর সেই গল্প।

আর প্রায়ই পয়সা দিতেন আমাকে। এক পয়সা, তু'পয়সা নয় —চার আনা, আট আনা। আর আশ্চর্য, খোঁজ নিতেন না, সে পয়সায় কি করেচি আমি!

দাদামশায়ের কাজ আদায় করবার একটি চমৎকার প্রথা ছিল। যার কাছ থেকে কাজ আদায় করবেন ঠিক করতেন, তাকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন। কথায় তাকে 'জল' ক'রে দিতেন। মিষ্টি কথায় সবাই বশ—এই সহজ সরল কথাটুকু কাজে লাগিয়ে তিনি বহু শক্ত কাজ অতি সহজে করিয়ে নিতে পারতেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে যে সব মজার কাণ্ডও ক'রে ফেলতেন এখন ভাবলে হাসি পায়।

দাদামশায়ের তু'জন মুহুরী ছিল। পূর্ণবাবু আর শশধরবাবু। তু'জনেই দাদামশায়ের কাছেই থাকতেন, ওখানেই খেতেন।

একদিন কী দরকার হ'লো, ঠিক করলেন, শশধরবাবুকে মহালে পাঠাবেন, বিশেষ কী দরকার!

দাদামশায় সেদিন বাইরের ঘরে শুয়ে আছেন, আর আমি তাঁর পাশে বসে। বাড়ির চাকরটা দাদামশায়ের পায়ে তেল মালিশ করচে। ঘরে আলো নেই, অন্ধকার। দরকার নেই বলেই আলো জ্বালানো হয়নি ঘরে।

হঠাৎ হাঁক দিলেন ঝি হরির মাকে। বললেন, কাছারি ঘর থেকে শশধরকে ডেকে দাও তো!

একটু পরেই এলেন তিনি।

দাদামশায় বললেন, এয়েচো, বসো ঐ টুলে!

বসলেন তিনি।

দাদামশায় শুরু করলেন, ছ্যাখো, ভেবে দেখলাম, মহালে তুমি গেলেই কাজটা হবে সহজে। এমারৎ মণ্ডল বড় পাজি লোক, তাকে পটাতে তুমিই পারবে। কাজেই পূর্ণকে পাঠালাম না। ও একটা গাধা। মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকে! গোবর পোরা। গুছিয়ে কথা বলতেও কি জানে ছাই! তাই তো বলি, একটু চটপটে হও, শশধরের মতো চালাক চতুর হও। তা গাধা পিটিয়ে তো আর ঘোড়া হয় না। তোমাকে আমি কাল-সকালে কাগজ-পত্তর সব বুঝিয়ে দেব, তুমিও সব গুছিয়ে নিয়ো। সেখানে প্রায় দিন সাতেক থাকতে হবে।

হঠাৎ তাঁর কি মনে হ'লো, বললেন, আর হ্যাঁ, পূর্ণর নিন্দে করলাম, তাকে আবার যেন গল্প করতে যেও না, বুঝলে?

উত্তরে ধরা গলায় কানে এলো, আজ্ঞে আমিই পূর্ণ!

আশ্চর্য, দাদামশায় একটুও অপ্রস্তুত হ'লেন না। বললেন, তুমি পূর্ণ! তা তুমি এলে যে?

পূর্ণবাবু বললেন, আজ্ঞে শশধর বাড়ি নেই, তাই আমিই এসেছিলাম, ডাকচেন কেন শুনতে।

দাদামশায় ব'কে উঠলেন, তা' এতক্ষণ ধ'রে তোমার নিন্দে দিব্যি শুনতে পারলে? বলবে তো তুমি পূর্ণ!

আজ্ঞে ··আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন পূর্ণবাবু, দাদামশায় ধমক দিলেন, যাক, আর 'আজ্ঞে' ক'রে দরকার নেই। যাও এখন। শশধরকে পাঠিয়ে দিয়ো। যত্ত সব।

কাণ্ড দেখে খুক্-খুক্ ক'রে হেসে ফেললাম আমি! তাড়াতাড়ি

উঠে পালালাম সেখান থেকে। সোজা উঠোনে গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে হো হো ক'রে হেসে নিলাম খানিকটা।

দিদিমা আমার হঠাৎ হাসি শুনে অবাক হ'য়ে বললেন, ওকি, হঠাৎ অত হাসি কেন? পাগল হ'লি নাকি?

তাড়াতাড়ি দাদামশায়ের ঘরটা দেখিয়ে বললাম, আমি না। দাদামশায়।

বড় বাঁধাকপি আর লোহার কড়াই

আমাদের পিকনিকের জন্যে একটা যুৎসই জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না।

কচে বললে, আমাদের দমদমার বাগান বাড়িতে হ'তে পারে। তবে বাবার কাছে একবার শুনে নিতে হবে।

শুনে আমরা সবাই লাফিয়ে উঠলাম, আরে ব্যাস্, এত বড় একটা সংবাদ স্রেফ বাদ পড়ে যাচ্ছিল! তুই কি রে? চলে যা এক্ষুণি তোর বাবার কাছে—বেশ সবিনয়ে তোর আর্জি পেশ কর্বি। বুঝ্লি?

হঠাৎ আমরা এমনভাবে রাজী হয়ে যাবো, কচে বোধ হয় বুঝতে পারেনি। তাই মাথা চুলকে বললে, একটা কিন্তু মুস্কিল আছে!

ঐ তো সুর কাটচো?—বিশে বললে।

না, ব্যাপারটা হচ্চে কি, বাগানে অনেক তরিতরকারি আছে তো। কাজেই যদি নষ্ট হয়, তাই বাবা হয়তো—

ঝণ্টুদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আমরা কি গরু যে তোদের বাগানে গিয়ে তরিতরকারি চিবুবো? রান্না তো হবে মাংস ভাত। বলি, মাংস তো আর তোদের বাগানে ফলে না!

—তা নয়। তবে—

আর তবে নয়।—ঝণ্টুদা বললে, যদি বলিস তো তোর বাবার কাছে একটা জয়েণ্ট পিটিশন ক'রে দিই—

—কি লিখবে?—জিগ্যেস করলাম।

কি আবার!—ঝণ্টুদা বললে, ইংরেজিতে তো আর লিখবো না, যে কলম কামড়াতে হবে। শীগ্রী বাংলাদেশে বাংলা ভাষাই হবে সরকারী ভাষা। কত সুবিধে! তাছাড়া কথায় আছে, আ মরি বাংলা ভাষা! মোদের গরব মোদের আশা। কাজেই অতি

সোজা বাংলায় লিখবো: সবিনয় নিবেদন, আমরা আপনার পুত্রবন্ধুগণ, নাবালক ধীর, শান্ত—আপনার সুবিখ্যাত বাগানে কিঞ্চিৎ মাংসান্ন—এটা একটু ভাল ভাষায় দিতে হবে—আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি আপনার সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইব না। ইতি—

বিশে বললে, খুব চমৎকার হবে।

কচে কিন্তু চমকে উঠলো, সর্বনাশ, ওসব হবে না।—একটু ভেবে বললে, আচ্ছা যা হয় আমি করবো।

—কি করবি?—জিগ্যেস করলাম।

—এপ্লিকেশানটা মা'র থ্রু দিয়ে সাবমিট করতে হবে।

—ঠিক! ঠিক বলেচে কচে।—সবাই বললাম আমরা।

এবং সত্যিই পরদিন কচে ছুটে এলো ক্লাবে! ··মার দিয়া কেল্লা।

অতএব পরের শনিবারের বিকেলে চাঁদা তুলে সব বাজার করা হলো এবং রবিবারের সকালে মাংসটা কিনে নিয়ে—দোকান থেকেই কাটিয়ে-কুটিয়ে চলে গেলাম বাগানে—কচেদের বাগানে।

সত্যিই বাগান বেশ সাজানো-গোছানো। ছোট্ট একটা পুকুরও আছে। আর পুকুরের পাড়ে নানারকম তরিতরকারির বাগান। লঙ্কা, মূলো, আলু, বেগুন, পেঁয়াজকলি, টমেটো আর বড় বড় বাঁধাকপি।

একদল চলে গেল রান্নার জোগাড় করতে। আর আমরা কয়েকজন এদিক-ওদিক বেড়াতে লাগলাম। কচেদের বাগান, কাজেই কচে যেন নায়ক হয়ে গেল।

কচে ছেলেটা বেঁটে হলে কি হবে—মুখে খুব লম্বা-লম্বা কথা। সেটা জানতাম আমরা। আর আজ ওদের বাগানে এসে বাধ্য হয়ে শুনতে হলো তার হাই-হাই-টক! সব দেখাতে লাগলো আর শুরু করলো তার গপ পো:

বাগানটা নাকি হরিহরপুরের জমিদার ওর বাবাকে প্রেজেন্ট করেছেন, তবে জমিদারকে খাজনা দেওয়া নিয়ম তো? তাই নাকি বছরে এক পয়সা করে খাজনা দিতে হতো। এখন সরকারকে দিতে হয় ছ' নয়া পয়সা করে। নারকেল গাছের কতগুলোতে শুধু ডাব হয়, আর কতগুলোতে একদম ডাব না হয়ে ডবল প্রমোশন পেয়ে একেবারে নারকেল ফলে।...আরো বললে, ওদের পুকুরে যে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়, তা নাকি গঙ্গার ইলিশের চাইতেও খেতে ভালো— খুব তেল, ওজন আধমণ ক'রে।

ঝণ্টুদা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলো, এবার আর থাকতে পারলে না। বললে, পুকুরে তো ইলিশ মাছ হয় না!

কচে বললে, কেন হবে না! ইলিশের পোনা ছাড়লেই হয়। আমরা বলে প্রতিবার শীতকালে পোনা ছাড়ি, আর গরমকালে জল কমে গেলে পটাপট তুলি আর খাই!

শুনে ঝণ্টুদা আমার গা টিপে শুধু বললে, অ!

কচে-র হাই-টক আমাদেরও আর ভাল লাগছিল না, বললাম, চল্ রান্নার ওখানে যাই।

কিন্তু কচে বললে, চল্ তরকারির বাগানটা দেখিয়ে আনি।

চল্।—দেখলাম ভেবে কচেদের বাগানে এসেচি যখন, তখন সে যা দেখায়, অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও দেখা দরকার।

তরকারির বাগান দেখতে দেখতে আমরা বাঁধাকপির ক্ষেতে এলাম। কচে বললে, এ আর কি বাঁধাকপি দেখচিস? গতবারে বাঁধাকপির পাতাগুলো প্রায় ছাতার মত হয়েছিল!—ছ'হাত ছড়িয়ে সাইজটাও দেখালে কচে।

ঝণ্টুদা বললে, লেডিজ ছাতার মতো?

কচে বললে, তুমি ভাবচো ইয়াক করচি? তবে বলি শোনো,

গতবারে আমরা এসেচি বাগানে, এমন সময় ঝমঝম করে বিষ্টি এলো। তাড়াতাড়ি বাঁধাকপির মাত্র একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আমরা—মানে বাবা, মা, আমি, আমার দুই ছোট বোন, আর একভাই—সবাই ছাতার মত মাথায় দিয়ে দাঁড়ালাম, এক ফোঁটা বিষ্টি আমাদের গায়ে লাগলো না।

—খুব তাজ্জব তো!—ঝণ্টুদা বললে।

আমরাও অবাক হয়ে বললাম, সত্যিই, এমন দেখা যায় না। তা' তোরা অমন বাঁধাকপির একটি এগ্‌জিবিসনে দিলি না কেন? প্রাইজ পেতিস্।

—আমরা বলেছিলাম, কিন্তু মা রাজী হলেন না। বললেন, লোকে নজর দেবে!

—ঠিক!—ঝণ্টুদা বললে আমাদের; তোরা কি জানিস? এ সংসারে কত কি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, জানিস তোরা? এই যেমন, গত বছরই আমাদের কারখানায় খুব বড় বড় লোহার কড়াই তৈরী করা হয়েছিল—এত বড় কড়াই যে মিস্ত্রীরা যখন কড়াইয়ের একদিকটা রিবিট করছিল—অন্যদিকে দাঁড়ালে হাতুড়ির আওয়াজই শোনা যাচ্ছিল না!

বিশে বললে, বাপ্‌স! এত বড় কড়াই!

কচে অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে, অতবড় কড়াই দিয়ে কি হতো ঝণ্টুদা?

ঝণ্টুদা গম্ভীর হয়ে বললে, তা জানিস্‌নে বুঝি? তোদের ঐ বড় বড় বাঁধাকপি রান্না করবার জন্যেই তো রে!

শুনে ক'চে বললে, ধ্যেৎ!

ব্যাপারটা গোলমেলে বুঝে আমরা তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম রান্নার দিকে।

বন্দুক আর বন্ধুরা

আমাদের পাড়ার পল্টুটা বড্ড ফাজিল। কেবল বড় বড় কথা। আর বড় বেশি চাল। সাজগোছের ঘটাঘটি খুব। পায়ে শুঁড়তোলা চটি, পরনে ঢোলা পায়জামা, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, মাথায় ওল্টানো টেড়ি। চোখে চশমাও পরে, পাওয়ার আছে কিনা কে জানে! হাতে ঘড়িও পরে, কখনো সেটা ফাস্ট যায়, কখনো স্লো। কিন্তু কারোর কিছু বলার উপায় নেই! বললেই বলে: জানিস, আমার ঘড়ি দেখেই বেলা একটায় কেল্লায় তোপ পড়তো?

নন্তেটা ঠোঁট-কাটা। দুচক্ষে দেখতে পারে না পল্টুর চালবাজি। বলে: রেখে দে ওর গপ্পো, ওর ঘড়ির মতে যদি তোপ্ পড়তো, তবে কোনদিন বেলা দশটায় পড়তো, কোনদিন পড়তো বেলা তিনটেয়। একটায় আর কোনদিন পড়তো না। আসল কথা কি জানিস, তোপের পাঁচমিনিট আগে, গোলাটাকে রড্ থেকে সরিয়ে, ঐ পল্টুকে ওখানে বসিয়ে দিতো।

আমরা সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠি। আসল কথা, ওরা দু'জন কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। ঠিক যেন, সাপে-নেউলে কিংবা আদায়-কাঁচকলায়, অথবা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, আর আমরা হচ্চি দর্শক।

আমাদের দলে গোপ্লাটা একটু বুদ্ধিতে খাটো। বোধহয় মাথায় ঘি নেই, স্রেফ গোবর পোরা। কোথায় কি বলতে হবে জানে না। সেদিন স্কুলের টিফিনের সময় আলুকাবলি কিনে খাচ্চি আর গপ্পো করচি, এমন সময় গোপ্লা বললে: জানিস ভাই, সেদিন খেলা দেখে ফেরবার সময় ট্রামে এত ভিড় হয়েছিল যে,

উঠতেই পারলাম না। কোনো ট্রাম আর স্টপেজে দাঁড়ায় না। পাঁচ ছ'খানা ট্রামের পেছন-পেছন ছুটে ধরবার চেষ্টা করতে করতে প্রায় অর্ধেক রাস্তা চ'লে এলাম। শেষে ধোত্তেরি ব'লে রাগ ক'রে বাকীটা পথ হেঁটেই মেরে দিলাম। যাক্ বাবা, চারটে পয়সা বেঁচে গেল।

চালবাজ পণ্টু গম্ভীর হয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সব শুনছিলো। ফট্ ক'রে মুখ বেঁকিয়ে বললে : ইস্, গোপ্লা, তুই বড্ড ভুল করেচিস্!

—কেন? কেন?—গোপ্লা জিগ্যেস করলে।

পণ্টু হেসে বললে : তুই যদি ট্রামের পেছনে না ছুটে ট্যাক্সিগুলোর পেছনে ছুটতিস, তবে নির্ঘাত তিন-চার টাকা বাঁচাতে পারতিস।

আমরা শুনে সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম বটে, কিন্তু গোপ্লার মুখটা কালো হয়ে গেল, ঝুলে গেল। চোখদুটো তার ছলছল ক'রে উঠলো। নন্তে তাড়াতাড়ি গোপ্লাকে বাঁচালে। ওর হাত ধরে দল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল : চলে আয় ইদিকে। শুনিস্ না ওর কথা। ফাজিল একটা।

তারপর অনেকদিন কেটে গেচে। পণ্টুর চালও বেড়েচে, নন্তের রাগও বেড়েচে, আর গোপ্লার বুদ্ধিও একটু বেড়েচে বোধ করি। কারণ আর সে বেশি কথা বলে না।

সেদিন এক বাগানে সবাই ফিস্ট করতে গিয়ে গল্প করছিলাম। রেমো বললে : আচ্ছা, এ সময় যদি একটা হরিণ আসে তো কি করবি তোরা?

প্রায় সবাই ব'লে উঠলাম : কেন? ধ'রে, কেটে, রান্না ক'রে খেয়ে সাবাড় ক'রে দেব!

—আর যদি একটা বাঘ আসে?—বললে রেমো।

এবারে প্রায় সবাই বললাম: বাঘ? বাঘ এলে চোঁ চাঁ পালাবো, নইলে বাঘটাই যে আমাদের সবাইকে সাবাড় ক'রে দেবে।

—দূর বোকা! পল্টু বললে: বাঘ কখনো সবাইকে একসঙ্গে মেরে আরাম ক'রে খেতে বসে? তারও প্রাণে ভয় নেই? আমাদের, যে-কোন একটাকে মুখে তুলে নিয়ে পালাবে। তারপর হেসে বললে: হয়তো নস্তেটাকে নিয়েই পালাবে!

নস্তের গা জ্বলে উঠলো বোধহয়। বললে: আমাকে কেন? আর তোকে নয় কেন?

পল্টু বললে: আমাকে নিলে বাঘটাকে মারবে কে? আমার বাবার বন্দুক আছে, তাই দিয়ে তাকে গুলি ক'রে মারবো।

অ!—নস্তে বললে: এতক্ষণে বুঝলাম। বাঘটা আমায় মুখে করলেই, আমি জোড়হাতে বলবো, দাঁড়াও হে ব্যাঘ্রমশায়, পল্টু বাড়ি গিয়ে তার বাবার বন্দুকটা নিয়ে এসে আগে তোমাকে মেরে তার বীরত্ব প্রকাশ করুক, তারপর তুমি আমাকে খেয়ো।

সবাই হেসে উঠলাম। রেমো বললে, সে আবার কি ক'রে হয়? বন্দুক ছুঁড়লে বাঘটা তো মরেই যাবে!

নস্তে বললে: তুই জানিস্ নে, পল্টু যখন বন্দুক ছুঁড়বে সামনের দিকে, হুস ক'রে গুলি বেরুবে ঠিক পিছন দিকে। এমনি ওর টিপ! আর নয়তো বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলবে: ভাই, বন্দুকটাকে মার ক্যাশবাক্সের মধ্যে অনেক খুঁজলাম, পেলাম না।

—মানে?—চটে গেল পল্টু।

—মানে, বন্দুক তোদের আছে কিনা তারই ঠিক নেই!—ঠোঁট উল্টে বললে নস্তে।

—বটে?—পল্টু বললে: জানিস্, ভুটানের এখনকার রাজার ঠাকুরদা বন্দুকটা আমার ঠাকুরদার বাবাকে প্রেজেণ্ট করেছিলেন।

অবশ্য কারণ ছিল। তিনি নাকি এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ওষুধে সেই রাজার রক্তআমাশা সারিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর, জানিস ঐ বন্দুক ঠাকুর্দার বাবা, ঠাকুর্দা, আর আমার বাবা বাঘ-ভাল্লুক সিংহ মেরে মেরে বন প্রায় উজাড় ক'রে ফেলেছিলেন। রীতিমত দামী বন্দুক। ডবল ব্যারেল। আর এমনি মজা, একবার গুলি ছুঁড়লে হয়, ঠিক গিয়ে জন্তুটার কপালের মাঝখান ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে পেছনধার থেকে—এত জোর!

নস্তে থামিয়ে দিল তাকে মাঝপথে। বললে: যা যা, বাজে বকিস না। দেখাতে পারিস তোদের বন্দুক? তা'লে বুঝি!

কথাটা শুনেই পল্টু কেমন থমকে গেল। বললে: দেখাতে? দেখাতে আমি পারি—তবে, তবে—

—তবে কি?

—মানে, খুব লুকিয়ে দেখাতে হবে, বাবা যখন অফিসে যাবেন দুপুরে, সেই সময়ে।

—কেন?—নস্তে প্রশ্ন করলে।

—মানে, পল্টু বললে: বাবা এখানে বদলি হয়ে আসার পর থেকে আর বন্দুক ধরেননি। কী ক'রে ধরবেন! এই কলকাতায় বন্দুক ছুঁড়তে গেলেই তো কারোর রান্নাঘরের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে! যা ঘিঞ্জি সব বাড়ি। আর আমাকেও বারণ ক'রে দিয়েচেন বন্দুক ছুঁতে—যতদিন না মেজর হই!

গোপ্‌লা আবার হঠাৎ বোকার মত বলে ফেললো: সে কি? তুই মিলিটারিতে ঢুকবি বুঝি? কিন্তু মেজর হবার আগেই তো তোকে বন্দুক ছোঁড়া শিখতে হবে রে!

পল্টু বললে: আরে বোকা, সে মেজর নয়! একুশ বছর হ'লে সাবালক হবো, তারপরে বন্দুক ছোঁড়া শিখবো!

নস্তে বললে : যাকগে, সে তুই যখন শিখবি শিখবি। এখন তোদের বন্দুক দেখাবি কিনা বল্।

পল্টু একটু ভেবে বললে : আচ্ছা, তোরা আসিস পরশু বুধবার দুপুরে, দেড়টা নাগাদ। মাও তখন ঘুমুবে।

বুধবার দেড়টায় গুঁড়ি-গুঁড়ি আমরা তিনচারজন গেলাম পল্টুদের বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। বাইরের ঘরে পল্টু আমাদের বসালো। দেখলাম, দেওয়ালে হরিণের শিং, মোষের শিং, ফরাসে বাঘের ছাল পাতা। পল্টু বললে : সব ঐ বন্দুকে মারা।

নস্তে বললে : দেরী করিস্নে, নিয়ে আয় তোদের বন্দুক। দেখি একবার হাতিয়ারটাকে ! বন্দুকটা কোথায় আছে জানিস্ তো !

পল্টু বললে : জানি, মা'র আলমারির তলায় বন্দুকের বাক্সে বন্ধ করা। বোস্ তোরা, আনি।

পল্টু চ'লে গেল। আমরা ভাবতে লাগলাম : সেই অদ্ভুত ভুটানী বন্দুকের কথা - যা ছুঁড়লেই গুলি গিয়ে লাগে জন্তুদের ঠিক মাঝ-কপালে। শুধু তাই নয়, যার দাপটে কত না জীব-জন্তুর ইহলীলা শেষ হয়েচে। কয়েকটি প্রমাণ তো আমাদের চোখের সামনেই।

একটু পরেই পল্টু এলো, পা টিপে-টিপে। হাতে তার লম্বা একটা বাক্স। টেবিলের উপর রাখলো সেটা। আমরা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তার উপর !

পল্টু মরচে পড়া ছিট্‌কিনি খুলে ডালাটা ওঠাতেই আমরা তো অবাক। বন্দুক কোথায় ? কাঠের গুঁড়োর মধ্যে জংধরা জোড়া-নলটা প'ড়ে আছে শুধু। আর বাক্সটা উইয়ে ভর্তি।

নস্তে ঠাট্টা ক'রে বললে : বন্দুক কৈ রে ? এতো দেখচি, একজোড়া নল ! লোহার বাঁশী বুঝি ? ক্লারিওনেট ?

পল্টুও অবাক হয়ে গেছলো। ছলছল চোখে বললে: উইগুলো বন্দুকের ব্যাটনটা, ইস্, একেবারে খেয়ে শেষ ক'রে ফেলেচে। বাক্সটা এতদিন খোলাই হয়নি তাই .....

গোপ্লা কবিতা বানিয়ে ফেললে:

উইগুলো বড় পাজি: দেখ ব্যবহার
ভুটানী বন্দুক খেয়ে করে ছারখার!

মনে হ'ল ঘরের হরিণ-মোষ-বাঘেদের ছিন্ন মুণ্ডুগুলো যেন হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। বন্দুককে যেন বললে: কি ভায়া? আমাদের মেরে শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলে উইয়ের পেটে!

রেমো বললে: সত্যি, কার কপালে যে কি ঘটে, বলা যায় না।

পল্টু বন্দুকের বাক্স বন্ধ করলে।

অচল টাকা ও চালু ছেলে

একখানা মটন কাটলেট আর এক কাপ চা খেয়ে ফট্‌কে কাউণ্টারে গিয়ে পকেট থেকে একটা রূপোর টাকা বার ক'রে দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেস্টুরেণ্টের মালিক তার হাতখানা খপ্‌ ক'রে চেপে ধরলো : অচল টাকা চালাতে এসেচো—জালিয়াৎ!

হঠাৎ বেখাপ্পা ধরা পড়ায় ফট্‌কে তো থ'! রেস্টুরেণ্টের অন্যান্য লোকগুলোও চঞ্চল হয়ে উঠলো। যাদের প্লেটে তখনও খাবার, সবে খেতে শুরু করেচে, তারা অবশ্য উঠলো না, তবে যারা প্লেট প্রায় সারা ক'রে এনেচে বা চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে বাকী, তারা সবাই প্রায় রা-রা শব্দে এসে পড়লো কাউণ্টারের কাছে : কি হয়েছে মশাই? ব্যাপার কি?

—আরে মশাই, এইটুকু ছেলে, জালিয়াতি শিখে গেচে!—মালিক হতাশায় ভেঙে পড়লো : এদেশের আর ভাস্যি নেই।

—হ্যাঁ, ওহে খোকা! এসব কি?—ত্বু-একজন প্রশ্ন করলো ফট্‌কেকে।

—আমি কি জানতাম?—ফট্‌কে তার মুখখানা কাচুমাচু ক'রে উত্তর দিলো।

—জানতে না? কচি খোকা!—একজন ধমকে দিতেই তার মুখ থেকে টোস্টের লালা-ভেজা টুকরো ত্বু'চারটে ঠিকরে এসে পড়লো ফট্‌কের গালে মুখে।

ফটকে বাঁ হাত দিয়ে (কারণ ডান হাত তখনও রেস্টুরেণ্ট-মালিকের হাতের মধ্যে ধরা) সেগুলো মুছে ফেলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে : সত্যি দিব্যি গেলে বলচি, আমি জানতাম না টাকাটা অচল!

মালিক দাঁত খিঁচিয়ে বললে: আবার দিব্যি করা হচ্ছে! ওতে তো আর পয়সা লাগে না।

এমন সময় একজন মোটা বেঁটে লোক, মাথায় টাক, দিব্যি ভুঁড়ি, ঘন ছাঁটা গোঁফ—এগিয়ে এলেন সামনে। হাফ-প্লেট মাংস আর পাঁউরুটি খেয়ে চায়ের কাপে তিনি চুমুক দিচ্ছিলেন। হঠাৎ ঐ গোলমাল শুনে তিনি ভাবলেন তাঁর ঐ চায়ের চাইতে ঐ ব্যাপারটাই বেশি মুখরোচক। তাই, তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ শেষ ক'রেই এগিয়ে এলেন।

ভদ্রলোক বললেন: দেখো খোকা, আমাকে যদি ঠিক ঠিক বলো, তবে ছাড়িয়ে দেব, নইলে পুলিশে—বুঝলে? আমি পুলিশে যখন ছিলাম, এমন ব্যাপার ঢের দেখেচি।

—ঠিক, ঠিক!—একজন এককালে-পুলিশের লোককে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো সবাই: ঠিক, আপনিই ব্যবস্থা করুন।

ভদ্রলোক বললেন: দেখো খোকা, তুমি যে অপরাধ করেচ, তাতে তোমার জেল হয়ে যেতে পারে। তুমি জাল টাকা চালাবার চেষ্টা করেচো!

ফটকের মনে ততক্ষণে বোধকরি একটু সাহস ফিরে এসেচে। হয়তো ভাবলো সে, এতগুলো লোকের কাছ থেকে চাঁদা ক'রে চাঁটি খেয়ে মরে যাওয়ার চাইতে বরং জেলে যাওয়া ঢের সোজা! বললে: বারে, আমি কি জাল টাকা তৈরী করি যে, জেলে যাবো?

—তবে? কোথায় পেলে ঐ টাকা?—ভদ্রলোকের কথায় পুলিশী ধমক।

ফটকে এবার ঢোক গিলতে লাগলো: ঐ টাকাটা? টাকাটা কোথায় পেলাম বলচেন? আজ্ঞে, টাকাটা—আমি—

—বলো না তাড়াতাড়ি!—আবার ধমক।

—এই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

—মিথ্যে কথা!

ফট্‌কে তাড়াতাড়ি শুধরে নিলো: না, না, ঠিক কুড়িয়ে নয়, তবে অনেকটা ঐ রকমের। একটি লোকের পকেট থেকে—

— অ, পকেটমার!—সবাই প্রায় আঁতকে উঠলো।

মালিক বললে: ছোঁড়াকে মার লাগানো দরকার—

—না, না—দাঁড়ান আপনারা।—একদা-পুলিশ কর্মচারী সবাইকে থামিয়ে দিলেন। ফট্‌কেকে বললেন: তোমাকে তবে তো পকেট মারের অপরাধে—

—কিন্তু আমার কথাটি আগে শুনুন।

—এর পরেও তোমার কথা শুনতে হবে? বেশ বলো—

—বলছিলাম কি—ফট্‌কে আবার ঢোক গিলতে লাগলো: ঐ টাকাটা যখন অচল তখন তো ওর কোন দামই নেই—

—তা তো নেই!

—কাজেই—ফট্‌কে বললে: আমি সেই ভদ্রলোকের পকেট থেকে টাকাটা নেওয়ায় তাঁর কোন ক্ষতিই হয়নি। কারণ ওটার তো কোন দামই নেই, ঢেলা! বরং তার পকেটের ওজন কমিয়ে দিলাম।

—আরে, এ যে বড় চালু ছেলে দেখছি।—সবাই ব'লে উঠলো।

প্রাক্তন-পুলিশ ভদ্রলোক হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন: হুঁ, এ ছেলেকে পুঁতলে পাকা ব্যারেস্টার হয়ে গজাবে দেখছি—

—কিন্তু, রেস্টুরেন্টের মালিক বললে: আমারই যে ক্ষতি হ'লো। একটা কাটলেট—

ফট্‌কে অতি করুণ সুরে বললো: আপনার ক্ষতি করতে

আসতাম না! কিন্তু অনেক দিন ধরেই ইচ্ছে ছিল, একটা গোটা মাটন কাটলেট খাবার! তাই—

এমন সময় একজন ভদ্রলোক হস্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন এসে রেষ্টুরেণ্টে! ফট্‌কেকে দেখে চিৎকার ক'রে উঠলেন: হতভাগা ছেলে! তোর এই কাণ্ড! পটলার কাছে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলাম! তোর মার দেরাজ থেকে অচল টাকাটা এনে এইসব কাণ্ড! কী খেয়েছিস্?...এই নিন মশায়, যা দাম। কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রলোক এক টাকার নোট একখানা টেবিলের ওপর রাখলেন। সবাই হাঁ হয়ে গেল।

ফট্‌কে মালিকের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে তার বাবার হস্তগত হ'লো। তবে পরে কি হ'লো জানিনে। কারণ, আমি আমার চিংড়ির কাটলেটে আবার মন দিলাম।

বলো, রাধা-কৃষ্ণ

শরৎদাদাবাবু কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থেকেই কবিরাজী করতেন। আমার জেঠতুতো বোনের স্বামী তিনি, অতএব আমাদের বাড়িটা তাঁর শ্বশুরবাড়ি এবং আমি তাঁর শ্যালক, সুতরাং আদরের পাত্র।

শরৎদাদাবাবুর চেম্বারই বলো, আর কবিরাজীখানা বা আয়ুর্বেদ ঔষধালয়ই বলো—সেটি ছিল বড়বাজারের এক সরু গলির মধ্যে। একদিন আমাকে নিয়ে গেছলেন সেখানে, বাপ্‌স্, সে কি গলি! দিনের বেলায় একটু ঝাপ্‌সা আলো আসে আর বর্ষাকালে বোধহয় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি—ব্যস্! পৃথিবীতে সূর্য ব'লে যে একটি পদার্থ আছে ঐ গলিতে থাকলে ধারণা করাও শক্ত।

কিন্তু শরৎদাদাবাবু কবিরাজ ছিলেন যেমন পাকা, তাঁর ব্যবসায়ী বুদ্ধিও ছিল তেমনিই চোখা। নইলে এত জায়গা থাকতে তিনি ঐরকম এক গলিতে মাথা গলাতে গেলেন কেন। আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর, মারোয়াড়ীদের বাক্সে হাত গলানো। মানে, মারোয়াড়ীদের কাছে কবিরাজী করে পয়সা কামানো।

তা' শরৎদাদাবাবুর মারোয়াড়ী রোগীদের হাত ছিল দরাজ। রোগী দেখে টাকা তো পেতেনই, ওষুধ বিক্রী ক'রেও বেশ কিছু উপায় করতেন—তাছাড়া উপরি ছিল হরেকরকম মাল। যথা, গেঞ্জী আধ ডজন, বা মোজা এক ডজন, বা রুমাল কতকগুলো; কখনো বা ঝাল-বোঁদে, চানাচুর, চাটনী, মোরব্বা, পাঁপড়, বড়ি ইত্যাদি।

তোমরা হয়তো ভাবচো ঘুষ এসব। না, না, ভেট! কবিরাজজী

অমন অসুখ সারিয়ে দিলেন ছেলের—আর তাঁর জন্যে সামান্য কিছু —এ আর এমন কি ? লিজিয়ে কবিরাজজী, হাম কো দেশকো চীজ ইসব—হেঁ হেঁ ! বিনয়ে সে রোগীর অবিভাবক নিশ্চয়ই অবনত হয়ে প'ড়তেন !

তাছাড়া তাঁদের বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকতো প্রায়ই। আর মারোয়াড়ী বাড়ির নেমন্তন্ন ! যত না খাওয়া, তার বেশি ফেলা। একবার নিয়ে গেছলেন এক নেমন্তন্নে। দিব্যি সার-সার ব'সেচি ছাদে। প্রথমেই দেখি দরবেশ, গজা, বালুসাই, বোঁদে, সব শুকনো মিষ্টি পড়তে লাগলো পাতে। আমি তো হাঁ। একি রে বাবা ! শরৎদাদাবাবু বুঝতে পেরে কনুই দিয়ে গোত্তা মেরে বললেন কানের কাছে মুখ নিয়েঃ কী, হাঁ ক'রে বসে কেন ? লেগে যাও !..... বললামঃ লুচি, পটল ভাজা কোথায় ? উনি হেসে বললেনঃ সে সব তোমার বিয়েতে হবে'খন, এ বিয়েতে নয়। নাও চালাও।.. অগত্যা চালাতে হ'লো হাত। তারপর দেখি আসচে নোনতা খাবারঃ খাস্তা কচুরি, সিঙাড়া, চানাচুর, পাঁপড়, চাটনি ইত্যাদি। লে বাবা ! মুখ বুজে, মানে কথা না ব'লে টপাটপ মুখে ভরতে লাগলাম। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা কয়েকখানি খেতেই যেন মুখ মেরে এলো। চাটনির টাকরা দিয়ে আরো কয়েকখানা চালিয়ে পেট টান ক'রে বসলাম।...কী হ'লো ? বললেন উনি। বললামঃ হ'লো, ভালোই হ'লো।

এহেন শরৎদাদাবাবুকে একদিন দেখি টিয়াপাখি সমেত একটি খাঁচা নিয়ে বাড়ি ঢুকচেন। গোল মুখখানা তাঁর খুশিতে উপচে পড়চে। ছুটে এসে সামনে দাঁড়ালামঃ মারোয়াড়ীরা কেউ দিয়েচে বুঝি ?

—না।

—তবে ?

—কিনেচি।

—কিনেচেন ? পাওয়া জিনিস আনতে দেখাই অভ্যেস আমাদের, তিনি যে কিছু পয়সা দিয়ে কিনতে পারেন, অন্ততঃ আমার মাথায় আসেনি আগে।

—কত নিলো ?—জিগ্যেস করলাম।

—সে খবরে কি দরকার ?—উত্তর দিলেন তিনিঃ কেমন পাখি, তাই বলো !

—চমৎকার !—বললামঃ কথা বলে ?

—না।

হতাশ হ'লাম আমিঃ তা হ'লে কি হবে !

—কেন, শেখাতে হবে !

—কে শেখাবে ? আপনি ?

—নিশ্চয়ই।

—কি বুলি শেখাবেন ?

—এখনো ঠিক করিনি। ভেবে ঠিক করতে হবে। যা-তা শেখালে তো হবে না, স্রেফ বকে যাবে।

টিয়াপাখির জামাই-আদর যা হ'লো, দেখবার মত। হবেই তো। একে শরৎদাদাবাবু আমাদের বাড়ির জামাই। তাঁর জন্যে একটা আদর বরাদ্দ করাই আছে, যদিও সেটা অনেকটা ঘরোয়া হয়ে গেচে। পাখিটি হচ্চে জামাইবাবুর। অতএব আরো আদরের। বাড়িতে নাত-জামাইয়ের আদর পেতে লাগলো পাখিটা। অবশ্য, আদর দিতে লাগলেন শরৎদাদাবাবু নিজেই।

ঠিক সময়মত খেতে দেওয়া দিনে চারবার ক'রে। রোজ হলুদ

জলে স্নান করানো, দুপুরে রদ্দুরের তাপ বাঁচাবার জন্যে খাঁচায় ঢাকা দেওয়া, দিনে দুবার ক'রে পাখির ময়লা ফেলা। শুধু তাই নয়, শরৎদাদাবাবু যেন দেরি ক'রে কবিরাজীখানায় খেতে লাগলেন, ফিরতে লাগলেন তাড়াতাড়ি। বাড়িতে যারা ঠাট্টা করতে পারে, ঠাট্টা করতে লাগলেন, ঝি-চাকররা হাসতে লাগলো মুখটিপে।

একদিন জিগ্যেস করলাম শরৎদাদাবাবুকে: কই? পাখিকে বুলি শেখালেন না?

এখনো বুলি ঠিক ক'রে উঠতে পারিনি।

পরম উৎসাহে বললাম: আমি কয়েকটা ঠিক ক'রে রেখেছি, বলবো?

—বলো, শুনি।—গম্ভীর হয়ে হাসলেন উনি।

লিষ্টি দিলাম: ভাত দাও

—উঁহু!

—তোমার নাম কি?

—উঁহু!

—খোকাবাবু এসো।

—নাঃ!

থেমে গেলাম আমি। দমে গেলাম। সব ক'টা বুলি বাতিল হয়ে গেল। যাকগে, যাঁর পাখি, তিনিই শেখান যা খুশি! মনটা অভিমানেই ভরে গেল।

ঠিক দু'দিন পরেই দুপুর বেলায় ডাক পড়লো আমার। শরৎদাদাবাবু তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন ইশারা ক'রে। গেলাম ঘরের ভিতর। দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। অন্ধকার ঘর। সব দরজা-জানলা বন্ধ। ব্যাপার কি?

পাখিকে বুলি শেখাবো আজ। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন।

আমিও ফিস-ফিস ক'রে জিগ্যেস করলাম : কি বুলি?

উত্তর দিলেন : বলো, রাধকৃষ্ণ মন আমার।

ধ্যেৎতেরি! এই বুলি! সেকেলে, পুরোন! বসে পড়লাম আমি মাটিতে। হয়তো হতাশায়। গুম্ হয়ে বসে থাকলাম, দেখা যাক্ কী হয়।

সেই অন্ধকার ঘরে চললো পাখির শিক্ষাদান :

বলো, রাধাকৃষ্ণ মন আমার।

বলো, রাধাকৃষ্ণ মন আমার।

বলো, রাধাকৃষ্ণ মন আমার।

শরৎদাদাবাবু একটানা ব'লে চলেচেন, কিন্তু পাখির মুখে রব নেই। হঠাৎ একবার ক্যাক্ ক্যাক্ ক'রে উঠলো।

এই, এইবার! বলো, রাধাকৃষ্ণ মন আমার!

কিন্তু পাখি চুপ করেই রইলো।

আরো ঘণ্টাখানেক 'বলো, রাধকৃষ্ণ মন আমার' বুলি আওড়ালেন শরৎদাদাবাবু। কিন্তু পাখির 'মন' কিছুতেই সায় দিলে না ওঁর কথায়।

অগত্যা সেদিনকার মত হাল ছাড়লেন পাখির মালিক।

কিন্তু পরদিন আবার চললো পক্ষী-শিক্ষা।

'বলো, রাধাকৃষ্ণ মন আমার' বলতে বলতে শরৎদাদাবাবুর মুখে ফেনা উঠে এলো বোধহয়, কিন্তু পাখির মুখ থেকে একটা কথাও বার করা গেল না।

আমিও দু'চারবার বুলি আওড়ালাম, তাও হ'লো না।

তৃতীয় দিনে ঘরে ঢুকে দেখি, শরৎদাদাবাবু একটা সরু কাঠি নিয়ে বসেচেন।

দু'চারবার বুলি আউড়েও যখন দেখলেন ছাত্র চুপ মেরে ব'সে আছে, দিলেন কয়েকটা খোঁচা। পাখিটা ভয়ে ক্যাক-ক্যাক ক'রে উঠলো। ডানা ঝাপটে স'রে স'রে বসলো। কিন্তু তবু বললো না—বলো, রাধাকৃষ্ণ মন আমার।

আরো দু'চারদিন পরেও যখন পাখি ক্যাক-ক্যাক ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছুই বার করলো না তখন তার শাস্তি হ'লো, না খেতে দেওয়া। তাতে ফল হ'লো এই, যেটুকু পাখিটা ক্যাক-ক্যাক করতো, তাও বন্ধ করলো। নেতিয়ে পড়লো পাখি।

—কিছু খেতে দিন, নইলে মরে যাবে যে।—বললাম আমি।

—যাক্‌গে ম'রে। পাখিটা নাস্তিক।

—কিন্তু পুষেচেন যখন, তখন খেতে দিতে হবে তো?

তেড়ে উঠলেন শরৎদাদাবাবুঃ ব্যাটা আমার অনেক ছোলা গুড় খেয়েচে ফাঁকি দিয়ে। আর না।

তখন আমিই খানিকটা ছোলা আর জল পাখির বাটিতে দিয়ে দিলাম। শরৎদাদাবাবু দেখলেন, বললেন না কিছু।

পরদিন সকালে উঠে দেখি পাখির খাঁচাটা খালি।

তাড়াতাড়ি শরৎদাদাবাবুর ঘরে ছুটে গিয়ে জিগ্যেস করলামঃ পাখি কোথায়?

দিব্যি নির্লিপ্ত গলায় বললেনঃ ছেড়ে দিয়েচি।

—ছেড়ে দিয়েচেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

শরৎদাদাবাবু হেসে বললেনঃ একটা অন্ধ ভিখিরি রোজ সকালে হরিনাম ক'রে ভিক্ষে করে দেখেচো?

—দেখেচি।

কেশবতী তেল

আমরা স্টীমারের ডেক-এ রেলিং হেলান দিয়ে গল্প করছিলাম। এক ভদ্রলোক আর আমি।

ভদ্রলোক আমার পরিচিত নন, তবে স্টীমার-যাত্রায় নদীর ঢেউ গোনা ছাড়া যখন আর কোন উপায় নেই, তখন কারোর সঙ্গে গল্প জমানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

অবশ্য ভদ্রলোক নিজেই যেচে আলাপ করলেন এবং তাঁর দু'এক কথাতেই বোঝা গেল, ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তবে ভদ্রলোক যখন নিজে এসেই কথা বললেন, তখন উত্তর না দেওয়াটাই হতো অভদ্রতা।

এক-একজন আছেন, যাঁরা কাউকে কথা বড় বলতে দেন না, নিজেরাই হরদম বলতে থাকেন—যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড। একবার বাজলে হয়, আর থামতে চায় না। ভদ্রলোক ঐ জাতীয় জীব একটি।

ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন, ধাম বললেন। কোথেকে আসচেন বললেন, কোথায় যাবেন বললেন, কোথায় দেশ বললেন এবং আরো হরবড় ক'রে অনেক কিছুই বললেন। আমি শুধু তাঁর কথার ফাঁকে 'হু-হ্যাঁ' ক'রে যেতে লাগলাম—যেন গানের তালে তবলার ঠেকা।

কথায় কথায় ভদ্রলোক বললেন, তাঁর কোনরকম নেশা নেই এবং পেশা 'কেশবতী তেল' বিক্রী করা। ঐ কোম্পানীর সেলস্‌ম্যান তিনি।

অথচ, আশ্চর্য, ভদ্রলোকের নিজের মাথাতেই টাক।

এবার আর কথা না বলে পারলাম না ঃ তা, আপনার মাথায় টাক যে ?

—হ্যাঁ, টাক !

বললাম, তবে ?

বললেন, এ টাক আগেকার, এখনকার নয়।

—তা, আপনি ঐ তেল ব্যবহার করেন না কেন ? নামটা শুনে তো মনে হচ্চে— মাথায় মাখলে চুল গজায়।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, ঠিক ধরেচেন। এ তেলের অদ্ভুত গুণ। যেখানে লাগাবেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চুল !

আশ্চর্য হ'য়ে বললাম, সত্যিই অদ্ভুত তো ?—

—নইলে কি আমি যা-তা তেলের জন্যে ঘুরে বেড়াই ?— ভদ্রলোক যেন কথাটা বললেন সগর্বে।

বললাম, তবে তো এতদিন আপনার মাথায় টাক থাকবার কথা নয়।

—নয়ই তো !—ভদ্রলোক বললেন, আমার টাকটা পৈতৃক কিনা, কাজেই একটু সময় নিচ্চে। আর হাজার হোক, পিতার দান— মাথা পেতে নিয়েচি, কাজেই হুট ক'রে তাঁর স্মৃতিটা নষ্ট করতেও চাইনে।

হাসি চেপে বললাম, তা তো বটেই !

ভদ্রলোক বললেন, 'কেশবতী তেল' তাই আমি ইচ্ছে ক'রেই অনিয়ম করে মাখি।

বললাম, অ !

—জানেন ?—ভদ্রলোক বললেন, একবার কি হয়েছিল ?

—কি ?

—গত বছরে এক বেটা চোর আমাদের স্টোর থেকে এক পেটি

তেল নিয়ে ভাগবার চেষ্টায় ছিল। এমন সময় দারোয়ান তাড়া করতেই তাড়াতাড়ি কাঠের বাক্সটা পুকুর পাড়ে ফেলেই দে চম্পট।

—তারপর!

—আর কি!—ভদ্রলোক বললেন, প্যাকিং বাক্সের ভেতরে তেলের শিশি অনেকগুলো গেল ভেঙে! আর সুগন্ধী তেল সব গড়িয়ে পড়লো পুকুরের জলে।

—সর্বনাশ! আপনাদের অনেক ক্ষতি হ'লো তো?

—তা হ'লো বটে। কিন্তু দারুণ পাবলিসিটি হয়ে গেল।

কি রকম?

—মানে, পুকুরের সব মাছের গায়ে, মুড়োয় চুল দাড়ি গজিয়ে গেল। ঐ তেল গায়ে লেগেছিল কি না?

শুনে গম্ভীর হয়ে আবার বললাম, অ।

—আর সেই খবর পেয়ে চারধার থেকে লোক আসতে লাগলো, জেলেরা মাছ ধরতে লাগলো, তবে আবার ছেড়ে দিতে লাগলো জলে। কী হবে ও সব চুলো মাছে? শেষে প্রেস ফটোগ্রাফাররাও এসেছিল!

এবার বললাম আমি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তো! এতক্ষণে মনে পড়চে আমার। দেখলেন কি ভুলো মন!

শুনে ভদ্রলোক এবার আশ্চর্য হলেন, আপনি জানেন ব্যাপারটা?

—জানিনে! খুব জানি।—বললাম আমিঃ যে ভদ্রলোকের পুকুরের মাছ নষ্ট হয়েছিল আপনাদের তেলে, সে ভদ্রলোক তো রেগে কাঁই। আপনাদের নামে দশ হাজার টাকার খেসারত দেবার জন্যে উকিলের চিঠিও দিয়েছিলেন।

—তাই নাকি?—ভদ্রলোক বললেন, আমি তো তা জানিনে।

বললাম, হয়তো আপনি তখন এই রকম বাইরে বেরিয়ে ছিলেন অর্ডার পত্রের জন্যে।

ভদ্রলোক ভেবে বললেন, তা —তা হবে।

আমি বললাম, যে উকিল চিঠি দিয়েছিলেন, তিনি আমার বন্ধু। তাঁর মুখে সব শুনেই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম আমি আপনাদের কর্তার কাছে। তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী হওয়ায় বাঁচিয়ে দিলাম তাঁকে।

—তাই নাকি ?

—নয় তো বাজে কথা বলচি ?

—না, মানে । ভদ্রলোক থতমত খেলেন।

বললাম, মানে পুকুর ধারের গাছের সব ডাল ভেঙে-ভেঙে পুকুরের মধ্য দিয়ে তাতে দু'তিন হাজার ব্লেড ছড়িয়ে দিলাম।

—ব্লেড ! ভদ্রলোক হাঁ করলেন।

বললাম, হ্যাঁ স্যার, ব্লেড, 'গুডমর্ণিং' মার্কা ব্লেড।

— কেন ? —ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

—কেন আবার ? মাছগুলো ঐ ব্লেডে ঘষে ঘষে গায়ের, মুড়োর সব চুল দাড়ি শেষ করে ফেললো। তা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

—আপনি বলেন কি মশায় ?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়, আর শুধু কি তাই ! পুকুরের মাছ তোলা হয়ে গেলে, বর্ষার আগে ঐ পুকুরের সুগন্ধী জলটা পাম্প করে তুলে ফুটিয়ে নির্যাস করে স্রেফ্ বিক্রী করে দিলাম আপনাদের কোম্পানীকেই !

শুনে ভদ্রলোক একটু যেন পিছু হটতে লাগলেন। বললেন, আপনি তো ভীষণ লোক।···আচ্ছা, চলি।

—কিন্তু আর একটু বাকী থেকে গেল যে !

—কি ? বলুন—

বললাম, আমিই হচ্ছি ঐ 'গুডমর্ণিং' ব্লেড-এর সেলস্‌ম্যান।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছে

দেখ, সত্যি গল্প ছাড়া বাজে গল্প আমি করিনে।

লাভ কি বলো? মিথ্যে গল্প একবার বলতে শুরু করলে সে অভ্যেস ছাড়া বড় মুশকিল। আরো মুশকিল, গল্পটা মিথ্যে বলে ধরা পড়লে, তোমরা কেন, কেউই বিশ্বাস করবে না। কাজেই গুল্ আমার কাছে এক চুলও পাবে না।

তবে অনেকেই হয়তো আমাকে বাগবাজারে যেতে দেখেচো। কিন্তু বিশ্বাস করো, ওখানকার বিখ্যাত গাঁজা-গল্প সংগ্রহ করতে আমি ওখানে যাইনে। যাই, আশ্চর্য হ'য়ো না যেন, পুণ্য সংগ্রহ—মানে গঙ্গাস্নানে। এহেন আমি, যে গল্প বলবো, কল্পনার ছোঁয়াচ নেই তাতে একটুও, খাঁটি সত্যি। আদি ও অকৃত্রিম।

কয়েক বছর আগেকার কথা।

পূজোর ছুটিতে পুরী যাচ্ছিলাম বেড়াতে। অর্থাৎ যেমন সবাই যায়। আমিও তেমনিই অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ উপায় ঠিক করেছিলাম অল্প পয়সায় চেঞ্জের। পুরী যাওয়াটা রথ দেখা কলা বেচার মতো—তা সে রথযাত্রার সময় না হ'লেও। কলকাতার হাতের কাছে জায়গাটা। ট্রেনে এক রাত্রির ব্যাপার। অতএব ট্রেন ভাড়াটা এমন বেশি নয়। তারপর এক ঢিলে দুই পাখি মারো, সমুদ্রধারে বেড়াও, স্নান করো, আবার জগন্নাথ দর্শন ক'রে পুণ্য অর্জন করো। চেঞ্জকে চেঞ্জ, পুণ্যকে পুণ্য!

পূজোয় চেঞ্জে যাওয়া। বুঝতেই পারচো ব্যাপারটা। অন্য সময় হ'লে ট্রেন ছাড়বার পনেরো মিনিট আগে স্টেশনে এসে, টিকিটটা কেটে, কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে শিস্ দিতে দিতে

বা গুনগুন ক'রে একটা বোম্বাই ছবির গানের প্রথম কলি ভাঁজতে ভাঁজতে একটা কামরায় ওঠো ; পরে দেখে-শুনে একটা জানলার ধারে ব'সে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে কুলিকে চার আনা পয়সা দিলেই —ব্যস্ এক সেলাম !

পূজোর সময়ে কিন্তু অন্যরকমের হালচাল। নাজেহাল কত রকমে হওয়া যেতে পারে তা ভালভাবে জানা যায়, ঐ সময়ে ট্রেনে চ'ড়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করলে। অবশ্য, যাঁদের বার্থ রিজার্ভ করা থাকে—থাকগে তাঁদের ট্রেন ভ্রমণে সুখ-সুবিধের কথা। তাঁদের কথাই হোক—যাঁদের কম পয়সার দম্ !

উচিত প্রথমে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে সে-সব গুণে নিয়ে মুখস্থ করা। বগলে জড়িয়ে নেওয়া দরকার বাড়তি সতরঞ্চি আর বালিশ। তারপর বাস-রাস্তায় গিয়ে হাত দেখিয়ে বাস থামিয়ে পাঁইজী ড্রাইভার কনডাকটরকে সাধ্য সাধনা ক'রে—এবং কিছু করলে পোঁটলা-পুঁটলিগুলো তার ঘাড়ের উপর ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়ো বাসে। তারপর বসা ? সরি, সীট খালি নেই। বগলের সতরঞ্চি জড়ানো বালিশটা এক হাতে চেপে অন্য হাতে হ্যাণ্ডেল ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে যাও স্টেশনে। শুরু হ'লো পূজোর ছুটি উপভোগের দুর্ভোগ। আর যদি সঙ্গে মেয়েরা থাকেন কিংবা ছোট ভাইবোনেরা থাকে, তবে তো আরো মজা। একটা ছেকরা গাড়ি ভাড়া ক'রে তাদের ঠেলে গেদে ভ'রে দরজা চেপে বন্ধ ক'রে দিয়ে গাড়ির ছাদ বোঝাই মালের মাঝখানে একটু জায়গা ক'রে নিয়ে দু'হাত দিয়ে দু'ধারের ছাদের লোহার রেলিং চেপে জোড় আসন হয়ে ব'সো। আর সেখানে জায়গা না থাকলে গাড়ির পেছনের পাদানিতে দাঁড়িয়ে গাড়ির পেছনের দুই আঁকড়া ধ'রে চলো। ট্যাক্সিতে বেশি লোক বা মাল নেওয়া যায় না, কাজেই এমনিতর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

তারপর স্টেশনে পৌঁছে কুলিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রে—দু'চার টাকা তাদের কবলে, টিকিট কিনে পয়সা-কড়ি গুণে-গেঁথে (হিসেবে ভুল হয়ে গেলেও তখন-তখন ধরবার কোনো উপায় নেই) দলবল নিয়ে একে ডিঙিয়ে, ওকে মাড়িয়ে, কিংবা বগলের তলা দিয়ে জিমনাস্টিক দেখাতে দেখাতে যখন প্লাটফরমে ঢুকবে তখন ঘড়ি দেখে আক্কেল গুড়ুম্। বারো পাটি দাঁত বার ক'রে তার দু'হাত নেড়ে বলবে হয়তো, ট্রেন প্লাটফরমে আসতে আরো এক ঘণ্টা দেরি! অতএব কী আর করা যায়? জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে প্লাটফরমের মানুষের জঙ্গলে ঘোরাফেরা করতে লাগলে। তারপর যেই একচোখে ইঞ্জিনটাকে গাড়ির বোঝা টানতে টানতে প্লাটফরমের দিকে আসতে দেখলে—তখন সাজ-সাজ রব প'ড়ে গেল চারিদিকে। তারপরের অবস্থা? ওঃ, ভাবাও যায় না যেন। গাড়ি প্লাটফরমে এসে দাঁড়াতেই এক যোগে সবাইকে মাথা গলিয়ে দিতে হবে তার ফাঁকে-ফোকরে, কুলিগুলোকেও মাল সমেত। দরজা দিয়েই যে ঢোকা সহজ এবং সমীচীন উপায়, তা ভুলে গিয়ে গাড়ির জানলা দিয়ে সশরীরে ঢুকে অনেকেই হয়তো দেখিয়ে দেবে ঐ উপায়ই বুদ্ধিমানদের পক্ষে প্রশস্ত।

অবশ্য পুজোয় চেঞ্জে যাবার ঐ সব ন্যাস্টি জিমনাস্টিক কাণ্ড দেখে হকচকিয়ে যাবারই কথা। কিন্তু সঙ্গে বাবা, কাকা, মামা, দাদা থাকলে অতটা ভাববার নেই তোমার। তবে তুমি যদি ঐ সব ব্যাপারে গার্জেন সাজতে যাও—তবেই গেলে! গেলে—মানে চেঞ্জে গেলে, না, প্লাটফরমে থেকে গেলে কিংবা বাড়ি ফিরে গেলে—সেটা সব নির্ভর করচে তোমার ভাগ্যের উপর!

যাক্, আমার কথাই বলি। আমার, বাপু, শরীরটায় মাস্‌লের বদলে মাংসল ভাগটাই বেশি। ওসব জিমনাস্টিক ব্যাপার আমার

ধাতে সয় না। তার উপর একলা মানুষ। ট্রেনে জায়গা না পাই তো দাঁড়িয়েই যাবো। না হয় কারোর মালের ঘাড়ে চেপে বসবো—এমনি গোছের একটা নিশ্চিন্ত ভাব মনে নিয়ে গাড়ি ছাড়বার আধঘণ্টা আগে প্লাটফর্মে ঢুকে দেখি সব গাড়িতেই 'ন স্থানং তিল ধারণং'! গাড়ির দরজা সব এঁটে সেঁটে বন্ধ করা। সব দরজায় পিঠ ঠেসে লোক দাঁড়ানো।

—মশায়, একটু জায়গা হবে?

—আজ্ঞে না।

—দাদা, এ গাড়িতে একটু জায়গা পাবো?

—জায়গা নেই ভাই!

—তবে কি ফিরে যাবো দাদা?

—আপনিই ভালো জানেন।

—জগন্নাথ দর্শন হবে না তা'লে?

—আপনার দুর্ভাগ্য!

—এদিকে টিকিট যে কিনেচি?

—ফেরত দিন গে!

—তা হ'লে আপনিই দিন গে। আপনার জায়গায় আমি দাঁড়াই!

এমন সময় সেই গাড়িটার মধ্যেই এক ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ ক'রে এগিয়ে এলেন দরজার কাছে। দরজায় দাঁড়ানো ভদ্রলোকের, অর্থাৎ যাঁর সঙ্গে এতক্ষণ আমার 'কী করা যায়' পরামর্শ চলছিল—তাঁকে ঠেলে দিয়ে সেই ভদ্রলোক বললেন: একটু সরুন তো, দরজা খুলি, বাইরে যাবো, প্লাটফরমে ভুলে একটা জিনিস প'ড়ে আছে। এগারোটা জিনিস এনেছিলাম, দশটা জিনিস আছে—

ভদ্রলোক গাড়ির কপাট খুললেন, আমারও কপাল খুললো।

ভদ্রলোক নামামাত্র—সুড়ুৎ ক'রে আমার মাংসল শরীরটাকে আধা ফাঁক করা দরজায় সেঁদিয়ে দিয়ে আমার পরামর্শদাতাটিকে হেসে বললাম: দেখবেন দাদা, জাঁতি কলে চাপবেন না যেন।

পরামর্শদাতাটি দাঁত খিঁচিয়ে পরামর্শ দিলেন: খুব হয়েচে, এখন আসুন, দরজা বন্ধ করি।

যাক্, গাড়িতে তো ঢোকা গেল। এবার বসার ব্যবস্থা করতে হবে। এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। ওঃ, মাটিতে, বেঞ্চে, বাংকে কোথাও একটু জায়গা নেই। বিশেষ ক'রে বাংকে জিনিসগুলো যেন পাহাড়ের মতো সাজানো। তারই দু'চারটে ফোকরে তালেবর দু'চারজন সটান শুয়ে এই সন্ধ্যেরাত্রে মটকা মেরে পড়ে আছে। থাকো বাবা, তোমরাই ভাগ্যবান। আগে এসেচো শুয়ে পড়েচো। বলবার কিছু নেই। দেখি, যদি বসবার একটু জায়গা পাই আমি। কাছেই দেখলাম, দু'টো বাক্সের ওপর একটা বিছানার বাণ্ডিল চাপানো। আস্তে আস্তে বিছানার ওপর হাত বোলাতে লাগলাম আর লক্ষ্য করতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে নজর দিচ্চে কিনা। শেষে সাহস বাড়লো, আস্তে ক'রে বিছানার বাণ্ডিলটা সরিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে স'রে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে দাঁড়াতে এক সময় ব'সে পড়লাম বাক্স দুটোর ওপরে। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগলো। কিন্তু কাউকে 'মুখ' করতে না দেখে বুকে সাহস পেলাম যেন।

এমন সময় দেখি, কামরার মাঝামাঝি জায়গায় এক মাঝ বয়সী ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়েচেন। সর্বনাশ। এই বুঝি বলেন, উঠুন আমাদের বাক্সর উপর থেকে, ভেঙে যাবে, যা চেহারা আপনার। কিন্তু দেখলাম, ভদ্রমহিলার লক্ষ্য আমার দিকে নয়, বাইরে প্লাটফরমের দিকে। আমিও মুখ ঘুরিয়ে ব'সে রইলাম অন্য দিকে চেয়ে।

—ওগো পেলাম না তো জিনিসটা—

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই আমার ভাগ্য-খোলা ভদ্রলোক।

—আর পেতে হবে না।—দাঁড়ানো ভদ্রমহিলা বললেন : উঠে এসো ভিতরে। ওটা বেঞ্চির তলায় আছে।

—তাই নাকি ?

ভদ্রলোক গাড়ির মধ্যে এলেন বহু কষ্ট ক'রে—দেখে দেখে, জিনিসের গাদার ফাঁকে ফাঁকে পা রেখে রেখে!

সব জিনিসের যখন শেষ আছে, কষ্টেরও শেষ আছে। গাড়ি চললো ঝিকি ঝিকি একটানা শব্দে। সোঁ সোঁ হাওয়ার আওয়াজ। যাঁরা মজা করে শুয়েছেন, তাঁদের নাক ডাকতে লাগলো। আর, যাঁরা ব'সেছেন সোজা হয়ে, তাঁদের অনেকেই ঢুলতে লাগলেন, কেউ ডাইনে-বাঁয়ে, কেউ সামনে ঝুলে। মাতালের মত অনেকেই এ-ওর ঘাড়ে ঢলে পড়তে লাগলেন। মিথ্যে বলবো না, আমিও ঢুলছিলাম, অবশ্য ডাইনে-বামে, না, সামনে ঝুলে, তা বলতে পারবো না।

হঠাৎ কে যেন আমার মাথায় জোরসে এক গাঁট্টা মারলো ঠকাস্ ক'রে। তন্দ্রা গেল টুটে। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি আমার সর্বাঙ্গ ভিজে। আমার পায়ের তলায় একটা কুঁজো উপুড় করা, কাঁধাটা ভেঙে গেছে, তখনও বক্‌বক্ ক'রে জল বেরুচ্ছে! আমারও চোখে জল আসার মত অবস্থা। মাথায় মার্বেল-গুলিতে হাত বোলাতে বোলাতে তাড়াতাড়ি আর এক হাতে কুঁজো সোজা ক'রে তার বকবকানি বন্ধ ক'রে—একচোট বকুনি দিলাম গাড়িশুদ্ধ প্যাসেঞ্জারকে : কার কুঁজো মশায়, আমার মাথায় এসে পড়লো, মাথা ফুলে গেল—কেটে গেল, কেটে গেছে বোধহয়, ভিজে গেছে সব ; বলি রাখবার জায়গা পাননি ? সগ্‌গে তুলেছেন কুঁজো! বলুন কার কুঁজো ?

সব চুপ্‌ !

প্যাসেঞ্জাররা 'ঠকাস্‌' শব্দেই জেগে উঠেছিলেন—কিন্তু আমার দুর্গতি দেখে থ' হয়ে গেছলেন। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না কেউ।

—বলুন, কার কুঁজো ? আবার হুমকি দিলাম।

—কেউ কি আর বলবে দাদা ?—এক ভদ্রলোক মুখ খুললেন : অথচ বোঝাও যাচ্ছে না কার ?

—সত্যি, বাঙ্কের উপর কুঁজো রাখা অন্যায় হয়েছে ভদ্রলোকের। আর এক ভদ্রলোক বললেন।

—বেশ!—আমি বললাম : না বলেন, নাই বললেন ; আমি দিলাম ফেলে কুঁজো! দেখি কেউ বলেন কিনা ?—মাটির কালো গলা ভাঙা কুঁজোটা তুলে ধ'রে বললাম : এখনো বলুন, নইলে দেবো ফেলে !

তবু কেউ দাবি করলো না কুঁজোর !

—আচ্ছা থাক কুঁজোটা !—বললাম : জল খেতে আমারই হয়তো দরকার হ'তে পারে।

কুঁজোটাকে পাশে রেখে আবার বসলাম বাক্সের সিংহাসনের উপর, এবার বিজয়ী রাজার মতো !

—মাথাটা কেটে-কুটে যায়নি তো ? আর এক ভদ্রলোক বললেন।

বললাম : কেন বলুন তো ? কুঁজোটি আপনার নাকি ?

—না, না, আমার না। জিগ্যেস করলাম,—কেন, জিগ্যেস করতে নেই ?

—না, কাটেনি ! ব'লে চুপ ক'রে গোঁজ হয়ে ব'সে রইলুম। আর কেউ আমাকে প্রশ্ন করতেও সাহস করলো না, পাছে তাকে আমি সন্দেহ করি।

কথায় আছে, সুখের পর দুঃখ ; দুঃখের পর সুখ !

মাথার উপর কুঁজো ভাঙলো বলে, কিন্তু কপাল ভাঙলো না।

বরং কপালে যা জুটলো— অভাবনীয়।

মিনিট দশেক সময় কেটেছে বোধহয়।

গাড়ির অনেকেই পূর্বাবস্থায় নিদ্রাদেবীর আরাধনায় ব্যস্ত, আমিও। এমন সময়, বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে, ফের আমারই কাঁধে হঠাৎ অবতরণ ক'রলেন 'ফটাস' ক'রে এক বস্তু !

গাড়ির সবাই শশব্যস্ত হয়ে চোখ মেলে চাইলেন আমার দিকে : আবার কি পড়লো মশায় ?

— কী জানি মশায়।—বিরক্ত হয়েই বললাম : কোন্ ভদ্রলোক যে জিনিস অমন এলোমেলো ক'রে সাজিয়েছেন বাঙ্কে জানি নে। এখন প্রাণ আমার যায় যে !

এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম, কী পড়লো। হঠাৎ দেখি, ঠিক আমার পেছনেই চৌকো সাদা বাক্স ফিতে বাধা, কোণটা থেৎলে গেছে। হাতে ক'রে উঠিয়ে দেখি—উরি বাবা !

—কী মশায় ওটা ?

—এজ্ঞে,—একগাল হেসে বললাম : সন্দেশের বাক্স। উঠে দাঁড়িয়ে বাক্সটা সবাইকে দেখিয়ে হেসে বললাম : এটাও নিশ্চয়ই কুঁজোর ভদ্রলোকের, অতএব বেওয়ারিশ মাল !

একটি ছোকরা সায় দিলো : নিশ্চয়ই। কুঁজোর গুতো খাবার পর সন্দেশ খাবার ছুতো আপনার আছে ! আগের দুর্ভোগের পর এবার উপভোগ করুন !

—ভাগ দেবো না কিন্তু কাউকে !

—নিশ্চয় নয় !—আর একজন বললেন।

—সে তো বটেই।—অন্য একজন বললো : কুঁজোর ভাগ নিই নি যখন, সন্দেশের ভাগ নেবো কি ক'রে ?

—তবে শুরু করি!—বাক্সর বাঁধন খুললাম: আপনারা অনুমতি করুন তা' হলে?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!—সবাই হেসে উঠলেন।

শুরু করলাম সন্দেশ খাওয়া। একটার পর একটা। নরম পাকের 'আবার খাবো' সন্দেশ, উপরে সর চাপানো। গোটা দশ বারো হবে। চারদিক থেকে উল্লাস ধ্বনি: চালান-চালান, চলুক-চলুক, সাবাড় করুন! অবশ্য যাঁর সন্দেশ, তিনি কিছু বললেন কিনা বোঝা গেল না, আর বোঝবার চেষ্টাও করলাম না। তবে দেখলাম এক ভদ্রলোক জানালার বাইরে চেয়ে বসে আছেন। থাকুন গে। তাঁকে আর ঘাঁটালাম না। যদি তিনি সন্দেশের মালিক হন তবে বোধ হয় তাঁর সাধের সন্দেশের ঐ দুরবস্থা না দেখতে পেরে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলেন।

সন্দেশ প্রায় সবটা শেষ ক'রে—ভাঙা কুঁজোটা মুখের কাছে এনে ঢকঢক ক'রে খানিকটা জল খেয়ে নিলাম।

কুঁজোটা নামাবার সময় কানে এলো, একটু দূরে একটি ছোট ছেলে তার মাকে বলছে, মা, আমি ঐ চন্দেশ খাবো।

—খাবে খোকা—এই নাও।--ছোট খোকার হাতে তুলে দিলাম একটা সন্দেশ

একজন ভদ্রলোক হেসে বললেন: যাক্ আপনার ভাগ্যটা ভালো। শেষটা বেশ হলো, না?

কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বললাম: আজ্ঞে, সবই বাবা জগন্নাথের ইচ্ছে। আমরা তো উপলক্ষ্য মাত্র। কার জিনিস কার ভোগে যায়, বলা দুষ্কর। সবই তাঁর হাত। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছে; তাঁরই লীলেখেলা।

পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি গদগদ হয়ে বললেন: তা তো বটেই।

একখানা টেলিগ্রাম

শান্নু দু'দুবার এম. এ. পরীক্ষায় ফেল ক'রে তৃতীয়বার যখন দিলো পরীক্ষা--কাউকে, এমন কি, বাড়ির কাউকেও জানালো না সে।

জানালো, যেদিন সে পাস করলো, মানে, একেবারে মার্কশিট নিয়ে সোজা বাড়ি এসে মাকে একটা ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরলো নম্বর-পাওয়া কাগজখানা।

হঠাৎ প্রণাম করতে দেখে মা তো হকচকিয়ে গেলেন, চোখের সামনে কাগজখানা দেখে কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জিগ্যেস করলেন মা, কী রে, কী কাগজ ওটা? আর প্রণামই বা কেন?

শান্নু হেসে বললো, বারে. এম এ. পাস করেছি যে! এই যে একেবারে হাতে হাতে প্রমাণ।

—ওমা, তাই নাকি রে! মা আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শুরু করলেন হাঁকডাক: ওরে কান্নু, ওরে রাণু কোথায় তোরা—কোথায় তোরা এদিকে আয়, শান্নু এম এ. পাস করেছে।

শান্নুর পরের ভাই কান্নু আর ছোটবোন রাণু ঘরে ছিল। মায়ের ডাকে তারা বেরিয়ে এসে আনন্দে শুরু করে দিলো হৈচৈ এবং বায়না ধরলো, সন্দেশ খাওয়াতে হবে। হঠাৎ পরীক্ষায় পাস করলে যা প্রায় সব বাড়িতেই হয়। এ-বাড়িতে আনন্দের বন্যা বইতে লাগলো।

মা হেসে বললেন, হবে, হবে। একটা ফর্দ করো—একটি ফিস্টি হওয়া দরকার। আর মনে পড়লো বিদেশে লক্ষ্ণৌতে তাঁর

বড়ছেলে পানু বা পান্নালালের কথা : পানু থাকলে বেশ হতো, যাক্ তাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দে, খবরটা দিয়ে। বহুত খুশি হবে সে।

শানু ঠোঁট উল্টে বললো, কি এসব করচো মা? ভারি তো পাশ! হু'হুবার ডিগবাজি খেয়ে—

তা হোক।—মা বললেন, তবু ধৈর্য ধরে পরীক্ষা দিয়েছিস্। পাশ করেছিস্—আর আমরা আনন্দ করবো না? যা, আগে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে আয় দাদাকে।

শানু মনের আনন্দ চেপে রেখে এমন ভাব দেখালো এসব পাসে আনন্দ করাটাই লজ্জার ব্যাপার এবং কাউকে খবর দেওয়াটা অবান্তর। সে রকম একটা মন্তব্য করতে গিয়ে মায়ের কাছে স্নেহের একটা ধমক খেলো শানু।

রাণু বললো, আহা মেজদা ঢং করছে।

কানু হেসে বললে, Try Try Try Again করলে—কত বড় কথা!

অতএব মায়ের কাছে টাকা নিয়ে বড়দার চাকরিস্থল লক্ষ্ণৌতে একটা টেলিগ্রাম করে আসতে হলো : MA Passed, Sanu.

দুদিন পরেই শনিবার।

সেইদিনেই সত্যসত্য ফিস্টি-এর আয়োজন হলো। আত্মীয় বন্ধুতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জনের ব্যবস্থা। চপ, কাটলেট, ফ্রাই, দুই রকম মিষ্টি, আইসক্রীম আর পান। এক এক করে জড়ো হলেন সবাই। অনেকেই সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রেজেন্টস্। হাসি গল্পে সারা বাড়িটা গম গম করে উঠলো।

এমন সময় দরজার সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। গোলমালে প্রথমে কেউ অতটা লক্ষ্য করেনি। কে না কে! কিন্তু

ট্যাক্সিটা চলে যাবার পরেই নীচেয় শোনা গেল করুণ কান্নার সুর। কী ব্যাপার? এ বাড়িতেই যেন। এক ব্যাচ খেতে বসেছিলেন, তাদের বন্ধ হয়ে গেল ডান হাত চালনা। অনেকেই ছুটে এলেন নীচেয়, কানু, রাণুও।

একি! দাদা, তুমি? এ বেশে?—কানু, রাণু প্রায় একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো: মা মা শীগগীর এসো—

মা?—চমকে মুখ তুলে চাইলো পানু। সাদা থান পরা, গায়ে চাদর, গলায় কাচা, চুল রুক্ষ, দাড়ি গোফ খোঁচা খোঁচা, হাতে কম্বলের আসন। ভিজে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে দেখলো পানু: মা—মা বেঁচে?

হ্যাঁ বেঁচে! রাণু বললে। অবাক সে: কেন, কী ব্যাপার! অবাক সকলেই।

মা, মা কোথায়? সটান উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় মাঝ পথে দেখা হয়ে গেল মায়ের সঙ্গে। পেছনে শানু এবং আরো অনেকেই।

হ্যাঁরে, একি বেশ! একি কাণ্ড! মা গালে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শানু এবং আর সবাই হতবাক্।

—তাহলে তুমি মা-রাণী বেঁচে আছো? পানু জড়িয়ে ধরলো মা'র পা দুটো।

—আমি তো কিছুই বুঝচিনে! মা প্রশ্ন করলেন।

—কেন, টেলিগ্রাম? এই যে—হাতের পয়সার থলি থেকে বার করলো পানু টেলিগ্রামখানা: এইতো লেখা MA Passed, Sanu.

—দেখি, দেখি!—শানু এগিয়ে এসে দেখলো, হ্যাঁ, তাই তো লেখা। MA-র মাঝখানে ফুলস্টপ নেই।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলো, শুরু হয়ে গেল হৈ-হৈ। শানু বললে, সব আমার জন্যে। আমি এবারও ফেল করলে আর এসব হ'তো না।

কানু বললে, আর ফেল করবার ভয় নেই কিনা তাই—

—ওঃ কী ভাবনাই না হয়েছিল। পানু তাড়াতাড়ি তার গলার কাচা একটানে ছিঁড়ে ফেললো।

মা তার হাত ধরে বললেন, আয়, ওপরে আয়।

একবাড়ি লোকের মাঝখানে পানু এবার লজ্জায় যেন এতটুকু হয়ে গেল। আমতা আমতা ক'রে বললো, মানে আমি তো টেলিগ্রাম খানা—হ্যাঁ, অফিসের বাবুদেরও তো দেখালাম। একবার ভাবলামও Mother না লিখে MA লেখা কেন? তা আমার এক বন্ধু বললে, আমেরিকায় আজকাল Father-কে PA এবং Mother-কে MA বলে, তাই বোধ হয় লিখেছে।

শানু হেসে বললো, তা বলে আমি তো Passed away লিখিনি। সেটা ভাবলে না কেন?

পানু বললে, সেটা ভাবলাম, টেলিগ্রামের পয়সা বাঁচাবার জন্যে away কথাটা বাদ দিয়েছিস্।—ব'লে ছোট ভাইয়ের উপর তম্বি করলে পানু: তোর এই লুকিয়ে পরীক্ষা দেবার জন্যেই তো—! M. A. আবার দিয়েচিস জানলে—

দেখচো তো সব? শানু গাল ফোলালো: আমি আজ খাবোই না। পাস করলেও বকুনি?

মা বললেন পানুকে: ও বরং টেলিগ্রাম করতে চায়নি। আমিই বলেছিলাম—। আর, আজ শানুর পাসের ফিস্টি!

পানু হেসে বললো, আর আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির দরজায় এটোঁ পাতা দেখে ভাবলাম, রাণু বুঝি বাপের বাড়িতে

এসেই তোমার তে-রাত্তিরের কাজ করচে। ছিঃ ছিঃ! কী কাণ্ড, এমনও ভুল হয়!

মা হেসে বললেন, ভালই তো হলো। মরার আগেই দেখে নিলাম, মরলে কি হবে। নে, এখন কাপড় ছাড়্।

ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা

আমার মাসীমা খুব চটপটে। আর ভারি পরোপকারী। তাঁকে যদি তুমি কোনো কাজ করতে বলো, আর ব'লে পরে ভুলে যাও—তিনি কিন্তু ভুলবেন না, ঠিক সে কাজটা তোমার ক'রে দেবেন। লজ্জায় প'ড়ে যাবে তুমিই! পাড়ার অনেকেই খবর রাখেন, আমার মাসীমা পরোপকারী। কাজেই পাড়ার অনেকেই আসেন আমাদের বাড়িতে মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে। মাসীমা আমাদের বাড়িতেই থাকেন কিনা!

পাড়ার সমীরের মা আসেন, হাতে রঙীন উলের নমুনা নিয়ে, মাসীমাকে বলেন, 'দিদি, আমার এই রংয়ের চার আউন্স উল এনে দেবেন, সমীরের সোয়েটার করবো। এখন হাতে টাকা নেই, আপনি এনে দেবেন, মাস শেষ হ'লেই উনি টাকা পাবেন, আপনাকে দিয়ে দেবো।'—মাসীমা ভারি খুশি, কাজ পেয়েচেন করতে। সেইদিনই নিয়ে আসেন উল, বৌটিকে দিতে গিয়ে শোনেন হয়তো—রংটা ঠিকমত মেলেনি! আবার পরদিন ছোটেন দোকানে।

তাছাড়া, কারোর সঙ্গে বিয়ের বাজার করতে হবে, কারোর বা ছেলে প'ড়ে গেচে সিঁড়ি থেকে—হাসপাতালে ছুটতে হবে তাদের নিয়ে, কার দু'খানা ঘরের দরকার, খোঁজ করতে হবে—অমনি মাসীমা ছুটলেন! হাতের কাছে আলনা থেকে টেনে নেন শাড়িখানা, দু'মিনিটেই কুঁচিয়ে পরেন সেখানা, পালিশ-করা জুতো জোড়ার মধ্যে পা ঢুকিয়ে, ছোঁ মেরে কালো চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়েই ছুটলেন উর্ধ্বশ্বাসে। আমরা স্বার্থপর মানুষেরা 'হাঁ' হয়ে যাই, ভাবি, পরের কাজের জন্যে এত তাড়াহুড়ো কেন?

তুমিও হয়তো মনে মনে ভাবচো, তোমার দাদা বা কাকাকে একটা লাটাই আনতে সেই কবে বলেছিলে--রোজই তাঁরা ভুলে যান ---কাজেই ওকাজটা আমার মাসীমাকে দেবে কিনা! লজ্জা কি! চলে এসো আমাদের বাড়ি, ব'লে দাও শুধু কেমন লাটাই চাই, হাতে পয়সা থাকে দিয়ো, না থাকে ক্ষতি নেই, পরে দিলেই চলবে, না দিলেও ক্ষতি নেই---শুধু তোমার কাজের ভারটি দিয়ে যেও, ভারি খুশি হবেন আমার মাসীমা!

বাড়িতে যখন এমন পরোপকারী মাসীমা--কাজেই নিজেদের কোন বিপদে আমরা ভয় খাইনে। সেদিন আমাদের রাঁধুনীর সঙ্গে আমাদেরই চাকর হরেকেষ্টর কী ঝগড়া হ'লো—রাঁধুনী বেঁকে বসলো: 'আমি থাকুম না এ বাড়িতে! আমারে অপমান!' আমরা অনেক বোঝালুম, বকলুম হরেকেষ্টকে, কিন্তু রাঁধুনী বুঝলো না। মাসীমা বললেন: 'যেতে দাও। ভেবেচে ও, পায়ে ধ'রে সাধবো। আমি রাঁধবো এবার থেকে।'

মাসীমার যে কথা সেই কাজ। রাঁধুনী পথ ধরলো, মাসীমা খুন্তী ধরলেন। অদ্ভুত চটপটে মাসীমা। ভোরবেলা ওঠেন, হরেকেষ্টকে ডাকেন, তাকে দিয়ে উনুনে আগুন দিইয়ে রান্না শুরু করেন। যখন রান্না সারা হয়ে আসে প্রায়, তখন আমরা ঘুম থেকে উঠে দাঁতে ব্রাশ ঘষতে শুরু করি। আমরা বলি: মাসীমা, এত তাড়াতাড়ি রান্নায় কী দরকার! এখন তো মোটে বেলা ৭টা। মাসীমা হেসে বলেন: তার মানেই বোঝো ঘড়িগুলো আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না!

সত্যিই ঘড়ির সঙ্গে অনেকেই পাল্লা দিয়ে পারে না; অথচ মাসীমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না ঘড়িগুলো। এমনি চটপটে আমার মাসীমা।

এবার একদিনের ঘটনা বলি :

আগেই বলেচি, বাড়িতে যখন এমন পরোপকারী চটপটে মাসীমা —কাজেই নিজেদের কোনো বিপদেই আমরা ভয় করিনে।···কিন্তু সত্যিই সে রাত্রে ভয় পেয়ে গেলাম আমরা!

নবদ্বীপে কাকীমার অসুখের খবর পেয়ে বাবা-মা সেখানে গেছেন। স্কুল কামাই হবে ব'লে আমরা চার ভাইবোন মাসীমার কাছেই আছি। মাসীমা বললেন : আমি এ ক'দিন তোদের ঘরে শুই, নইলে তোদের ভয় করবে। আমি বললাম : তোমার কিচ্ছু ভয় নেই! সাহস দেখাবার লোভে আর তিনজনও আমার কথায় সায় দিলে। কাজেই মাসীমা শুতেন মাসীমার ঘরেই। আমরা চার ভাইবোন দরজা এঁটে গান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তাম। সেবার আমি, পুঁটু, নন্তে, নেলী রোজকার মতো এক খাটেই ঘুমুচ্চি—এমন সময় আমাদের ঠিক নাকের উপরেই ছাদে 'দুম্' ক'রে কিসের শব্দ হ'তেই ঘুম ভেঙে গেল। নন্তেটা কুম্ভকর্ণের মতোই ঘুমোয়। ওর ঘুম ভাঙলো না। পুঁটুর কিন্তু ঘুম ভেঙে গেচে। শুনতে পেয়েচে শব্দ। আমার পিঠে অল্প ঠেলা দিলো। আমিও পা দিয়ে ওর পা চেপে দিয়ে জানালাম, জেগে আছি, শুনতে পেয়েছি শব্দ!···এমন সময় আবার মনে হলো, কে যেন ছাদে চলচে। পায়ে চলার শব্দ। গাটা ছমছম ক'রে উঠলো। চোখ বুঁজেই প'ড়ে রইলাম। পুঁটুও ভয় পেয়েচে। ফিসফিসিয়ে বললো : দাদা!

—কী?

—চোর নাকি?

—কী জানি!

—ভূত নয় তো!

—হ'তে পারে।—মনে প'ড়ে গেল, আমাদের পাড়ায় একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি ব'লে বোকার মতো আত্মহত্যা করেচে কয়েকদিন আগে। সে নয় তো! হয়তো রাত্রে এছাদ-ওছাদ ক'রে বেড়াচ্চে। অনুতাপে ছটফট করচে তার বোকামির জন্যে।

পুঁটু বললে: আমি কিন্তু শুনেচি, ভূতেদের পায়ে শব্দ হয় না।

—তবে বোধহয় চোর!

এমন সময় আবার একটা 'খট্' ক'রে আওয়াজ হ'লো ছাদে।

আমি বললাম পুঁটুকে: ডাক ওদের। আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে ডাক।

নিজের ওপর রাগ হ'তে লাগলো। কেন যে মিছে হাম্বড়াই করতে গেলাম। এখন যদি মাসীমাকে কাছে পেতাম, কোনো ভয়ই ছিল না। এঘর থেকে ডাকলেও তিনি শুনতে পাবেন না। মাঝখান থেকে আমাদের গলার শব্দ পেলে চোরটা বা ভূতটা হয়তো আমাদের গলাই টিপে ধরবে। ওরা সব পারে! যারা অনায়াসে বাড়ির ছাদে উঠতে পারে, জানলা গলিয়ে ঘরে আসতে তাদের কতক্ষণ!

পুঁটু বহু চেষ্টায় কুম্ভকর্ণ মার্কা নন্তেকে উঠালো। নন্তে শব্দ শোনেনি, কাজেই ভয়ও পায়নি। তাই বললাম: এই নন্তে, আলো জ্বাল্!

নন্তে উঠে ব'সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে: তুই জ্বাল্ না। আমি পারবো না।—ব'লেই আবার শুয়ে পড়লো।

পুঁটু বললে: ওঠ্ ভাই লক্ষ্মী, জ্বাল আলোটা!

মিষ্টি কথায় কে না বশ হয়! নন্তে বললে: কেন? কী হয়েচে?

—বলবো পরে।—আমি বললুম: তুই জ্বাল্ না ভাই।

নন্তে তড়াং ক'রে একলাফে খাট থেকে নেমে ঘরের সুইচটা টিপে

দিলো। আলো জ্বালতেই সাহস হলো প্রাণে। বিছানায় উঠে ব'সে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত্রি একটা বেজে পাঁচ মিনিট।

পুঁটু বললে : মাসীমাকে ডাক।

আমার তখন খানিকটা সাহস হয়েচে। বললাম : না, না। আমাদের ভীতু মনে করবেন। ওর চাইতে বরং হরেকেষ্টকে ডাকা যাক।

হরেকেষ্টটার আবার কাল থেকে জ্বর হয়েছে জানি। তবু এই বিপদে 'হরেকেষ্ট'র মত সুহৃদ আর কে আছে আমাদের? তার নামটা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি জপ করতে লাগলাম।

নন্তেটার কী সাহস! শব্দ শোনেনি কিনা। বলিও নি তাকে কী হয়েচে। কাজেই দিব্যি সিঁড়ির মুখ থেকে ডাক দিলো হরেকেষ্টকে। একটু পরেই হরেকেষ্ট এলো গায়ে কাপড় জড়িয়ে। বললে : কী হয়েচে দাদাবাবু?

—ছাদে চোর এসেছে। লাঠি নিয়ে চল্।

পুঁটু বললে : বোধহয় ভূত!

নন্তে বললে : দাঁড়া, নেলীকে ডাকি। নইলে একলা ও ভয় পাবে। কী হয়েছে রে?

এবার নন্তেও ভয় পেয়ে গেল। নিজে ঘরে না গিয়ে হরেকেষ্টকে হুকুম করলে : এই, নেলীকে কোলে ক'রে নিয়ে আয়।

হরেকেষ্ট ঘুমন্ত নেলীকে কোলে নিয়ে ডান হাতে নিলো একটি লাঠি। আমি আমার ছাতাটা। নন্তে নিল তার হকি ব্যাট্‌টা আর পুঁটু তার ছোট বঁটিটা। হরেকেষ্ট আগে আগে ছাদে উঠলো, আমরা পেছনে। হাল্কা পায়ে আমরা উঠচি। বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করচে। কারোর মুখে কথা নেই। একবার মনে হ'লো, মাসীমাকে ডাকলেই যেন ভালো হ'তো।

ছাদে উঠলাম।

উঠে যা দেখলাম, তাতে চক্ষু চড়কগাছ। দেখি, মাসীমা ছাদে রান্নাঘরে আলো জ্বালিয়ে রান্না করচেন। আমরা তো অবাক। মাসীমাও কম অবাক নন। বললেন: এ কীরে, তোরা সব দল পাকিয়ে লাঠি-সোটা নিয়ে হাজির কেন?

আমি বললাম: ছাদে অনেক্ষণ থেকে শব্দ হচ্ছিল যে। আমরা ভেবেচি চোর।—ভূতের কথাটি চেপে গেলাম।

—দূর, বোকারা! আমি যে রান্না করচি।

—রান্না? এত রাত্রে?—পুঁটু বললে।

—কেন, কটা বেজেচে?

—এখন রাত্রি একটা।

—একটা!—মাসীমা অবাক হ'লেন: আমার ঘুম ভাঙতেই ভাবলাম, শেষরাত্রি। তাই রোজকার মতো রান্না করতে এসেচি। হরেকেষ্টটার অসুখ ব'লে তাকে আর উনুন ধরাতে ডাকিনি আজ! অপ্রস্তুত হয়ে মাসীমা বললেন: নাঃ, ঘরে একটা ঘড়ি না রাখলে চলে না দেখচি।

হেসে বললুম: তুমি অত চটপট কাজ সারলে ঘড়িগুলো কোনোদিনই পাল্লা দিয়ে পারবে না তোমার সঙ্গে।

মাসীমা হেসে বললেন: ঘড়িকে জব্দ করতে গিয়ে আজ আমিই জব্দ হয়ে গেচি দেখচি।

দশ নয়া পয়সা

আমাদের পাড়ার ঝণ্টু তার দলের একজন মাতব্বর। দশ বছরের ছেলে, কিন্তু অমন দস্যি খুব কমই দেখা যায়। সমবয়সীরা তো ওর ভয়ে কাঁপে। দু'চার বছর বড় যারা বয়েসে, তারাও ঝণ্টুকে সমীহ ক'রে চলে। শোনা যায়, যারা পরে দেশের নেতা হয়েচেন, তারা নাকি ছোটবেলা থেকেই এমন ভাবে দলের সর্দারি ক'রে হাত পাকিয়েচেন। কাজেই ঝণ্টুর চাল-চলন দেখে অনেকেরই ধারণা, ভবিষ্যতে এ ছেলে হয় আর একটা 'নেতাজী' হবে, আর বে-লাইনে গেলে নির্ঘাত হবে গুণ্ডার সর্দার!

যাক, ঝণ্টুর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের ভাববার দরকার নেই। সে যদি নেতাজীর মতো হয়, তখন না হয় তার গলায় মালা পরানো যাবে; আর যদি গুণ্ডার সর্দার হয় তখন পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াবে তার হাতে লোহার কড়া পরাবার জন্যে। আমি বরং বর্তমানের ঝণ্টুর কথাটাই তোমাদের কাছে বলি।

ঝণ্টুর ড্রেস বলতে গেঞ্জি আর ইজের। খালি পা। চুল ছোট ক'রে ছাঁটা (ওটা ওর বাবার নির্দেশে), মুখে হুইস্‌ল (দলের ছেলেদের ডাকবার জন্যে) কিংবা সিনেমার অতি আধুনিক হিন্দী গান! ঝণ্টুর প্রত্যেকখানা পড়বার বইয়ের প্রথম ৪।৫ খানা পাতা থাকে না, কোথায় যেন উড়ে যায়। কারণ, তার মতে বইখানার নাম কি, কার লেখা এবং কি কি আছে—এসব অবান্তর। আর ও-সব যখন পড়তে হয় না, তখন বাড়তি বোঝা রেখে লাভ কি? তা ব'লে কি বইয়ের অন্য অন্য পাতাগুলোও সে খুলে পড়ে? তাও না! অথচ, আশ্চর্য, ঝণ্টু প্রত্যেক বারই ভাল ক'রে না হোক, দিব্যি

পাশ করে যায়। কী বলচো? টুকে? না, না, তাও নয়। সে তো অন্যের সাহায্য নেওয়া, অন্যের কাছে নীচু হওয়া!—ঝণ্টুর পাশ করবার একমাত্র কারণ, ঝণ্টু যা ক্লাশে একবার শোনে, তা আর ভোলে না জীবনেও।

ঝণ্টুর বাবা একবার ঝণ্টুর জন্যে মাস্টারমশায় ঠিক করেছিলেন। কিন্তু ঝণ্টু দেখলো মাস্টারমশায় তার কাছ থেকে পড়া আদায় না ক'রে, তিনি নিজে সব পড়ে দিয়ে চলে যান। অঙ্ক ভুল করলে নিজেই সবটা কষে দেন। তাকে দিয়ে কষিয়ে নেন না, কারণ তাতে সময় নষ্ট হয়, বেশি বকতে হয়।··· তাকে পড়িয়েই অন্য জায়গায় পড়াতে যেতে হবে যে।

ঝণ্টু ক'দিন সেই মাস্টারমশায়ের কাছে পড়ে শেষে একদিন বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

—কী রে?—বাবা বললেন।

—দেখো বাবা, আমি ক্রমেই যেন খোঁড়া হ'য়ে যাচ্ছি!—ঝণ্টু বিরস বদনে বললো।

—সে কিরে?—বাবা চমকে উঠলেন, পায়ে লেগেছিল নাকি? কি ক'রে লাগলো? কোন্ পায়ে?

ঝণ্টু বললো, পায়ে না, মনে!

—মনে মনে খোঁড়া হচ্চিস মানে?

ঝণ্টু বললো, মানুষ ঘোড়া দেখলে যেমন খোঁড়া হয়, আমি তেমনি মাস্টারমশায়কে দেখে খোঁড়া হয়ে যাচ্ছি। আমার আর নিজে থেকে কিছুই ভাবতে ইচ্ছে করে না, কেন না, মাস্টারমশায়ই আমার জন্যে ভেবে দেন!—তুমি ঐ মাস্টারমশায়কে ছাড়িয়ে দাও।

শুনে বাবা হেসে ফেললেন, খুশিও হ'লেন মনে মনে।

বললেন,—ঝণ্টু, তোমার কথা শুনে আমি বেশ খুশি হ'লাম।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও, ঠেকে শিখতে চাও, এইতো মানুষ হবার পথ।

পরদিনই মাস্টারমশায় বিদায় হ'লেন, কিন্তু বুঝতে পারলেন না, কারণটা কি? এত খেটে পড়ালেন, অথচ···। না, কারোর ভাল করতে নেই, তিনি ভাবলেন!

এ হেন ঝন্টু নিজের মনের মতো, বা পছন্দ মতো যখন যা করতো, তার মা বা বাবা তাতে বাধা দিতেন না। জলের স্বাভাবিক স্রোতে বাধা পড়লে, তা ফুঁসে-গর্জে ওঠে, বিপথে ছড়িয়ে পড়ে—সে কথা জানতেন তাঁরা।

কিন্তু ঝন্টু একদিন এক মজার কাণ্ড ক'রে বসলো। একদিন একদল লোক বন্যার জন্যে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে করতে তাদের পাড়ার মধ্যে এসে পড়লো। পাড়ার সবাই যে যা পারলো দিতে লাগলো। ক্রমে তারা এলো ঝন্টুদের বাড়ির কাছে। ঝন্টুর বাবা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বন্যার জন্যে ঐ দলটিকে দেখে তাঁরও মনে হলো, সাহায্যার্থে কিছু দেওয়া দরকার। তাই তিনি বারান্দা থেকে ঘরে এসে জামার পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে ঝন্টুকে ডাকলেন।

ঝন্টু তখন অন্য ঘরে একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল। অর্থাৎ একটি ভাল টর্চের সব কিছু খুলে আবার কীভাবে সেটা ফিট করা যায়, তার ফন্দি আঁটতে ব্যস্ত। এমন সময় বাবার ডাক শোনায় তাড়াতাড়ি এসে বললো, আমায় ডাকচো বাবা? ঝন্টুর বাবা তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বললেন, যা তো নিচেয় গিয়ে টাকাটা দিয়ে আয়।

ঝন্টু টাকাটা হাতে নিয়ে বাবাকে বললো, বাবা, দশটা নয়া পয়সা দেবে? একটা পেন্সিল কিনবো।

তিনি ঝণ্টুকে একটা দশ নয়া পয়সা দিয়ে দিলেন। ঝণ্টু নিয়ে বোঁ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তর্‌তর্‌ ক'রে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

নেমেই দেখলো সদর দরজার কাছে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, তাঁর এক হাতে টিনের বাক্স একটা আর অন্য হাতে একখানা কাগজ : বন্যা পীড়িতদের জন্যে সাহায্যের আবেদন।

হ্যাণ্ডবিলখানা ঝণ্টুর হাতে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমরা এসেচি বন্যার সাহায্যের জন্যে। যার যেমন ইচ্ছে, কিছু দান করলে ভাল হয়!

কথাগুলো ঝণ্টু মন দিয়ে শুনলো। তারপর জিগ্যেস করলো, যার যেমন ইচ্ছে, দিলেই চলবে?

নিশ্চয়ই!—ভদ্রলোক আশা পেয়ে জোর গলাতেই বললেন।

—বেশ, তবে এই নিন!—ঝণ্টু তার হাতের দশ নয়া পয়সাটা গোল টিনের কৌটোর মধ্যে ফেলে দিল।

—আচ্ছা ভাই!—ভদ্রলোক হেসে চলে গেলেন। তখন তার গানের দল অনেকটা এগিয়ে গেচে। তিনি তাদের ধরতে গেলেন।

ঝণ্টু চলে এলো সোজা ওপরে। মুখে একগাল হাসি। যেন বিশ্ব-বিজয় করে এলো। বাবার কাছে এসে বললো, আমি নেবো টাকাটা?

—সে কি?—অবাক হলেন ঝণ্টুর বাবা: টাকাটা দিলিনে ওদের?

—দিয়েচি!—ঝণ্টু বললো, দশ নয়া পয়সাটা দিয়েচি।

—সেকি রে?

ঝণ্টু বললে, বারে, ওরাই তো বললে যা ইচ্ছে দিতে। তাই আমার ইচ্ছে হলো—

—টাকাটা রেখে পয়সাটা দিতে ? না ?—দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন : আচ্ছা, ছেলে তো তুই ? যা শীগ্‌গীর টাকাটা দিয়ে আয় –

অগত্যা ঝন্টুকে ছুটতে হলো। ভদ্রলোককে খুঁজে বার ক'রে তার টিনের বাক্সর মধ্যে ফেলতে হলো কাগজের নোটখানা এবং মাথা চুলকে ভারি মনে ফেরবার সময় ভাবতে লাগলো, না, কাজটা ভুলই হয়ে গেচে। বেশি লোভ করতে গিয়ে দশ নয়া পয়সাটাও গেল।

তলোয়ারের খোঁচা আর কলমের খোঁচা

দিল্লীতে মুঘলবাদশা সাজাহান তখন রাজত্ব করতেন। সেই সময় অনেক হিন্দুও রাজকর্মচারী হিসেবে সাজাহানের অধীনে কাজ করতো।

কায়স্থেরা বেশির ভাগই লেখাপড়ার কাজ করতেন। রাজ-দপ্তরে কলম চালানোই তাঁদের পেশা ছিল। তাছাড়া দরখাস্ত লিখে বা চিঠি লিখে এই সব কায়স্থেরা স্বাধীন ভাবেই অর্থ উপায় করতেন।

এই কালি-কলম দিয়েই যখন তাঁদের পেট চালাতে হতো, তখন তাঁদের কাছে ঐ কালি-কলমই ছিল আশা-ভরসা। কাজেই তাঁরা নিয়মিত পূজা করতেন দোয়াতদানী আর কলমকে।

তবে এই পূজার পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত রকমের। ভোরে উঠে স্নান করে ঠাকুরের সামনে রাখতেন তাঁদের দোয়াত আর কলম। আর পাশে রাখতেন এক বোতল দামী মদ। মন্ত্র পড়ে, সেই মদ বোতল থেকে খানিকটা দোয়াতের মধ্যে ঢেলে দিতেন এবং হাতের আঙুল দিয়ে খানিকটা ছড়িয়ে দিতেন ঠাকুরের গায়ে।

আর মনে-মনে কামনা করতেন, রাজ-দপ্তরে তাঁর চাকরিটা যেন বজায় থাকে বা উন্নতি হয় ; কিংবা আজ যেন দরখাস্ত বা আর্জি আর চিঠি লিখে বেশ কিছু বেশি টাকা বা রূপেয়া উপায় করতে পারেন।

একবার রাজ-দপ্তরের এক কায়েত বা কায়স্থ কর্মচারী ভারী মজার ব্যাপার করেছিলেন।

তাঁর কাজ ছিল হিসেব করে প্রতিমাসে একদল সৈন্যের মাইনা মিটিয়ে দেওয়া।

একবার একজন সৈন্য দেরি করে সেই কর্মচারীর কাছে মাইনা নিতে এলো। তার দলের সৈন্যেরা মাইনা নিয়ে চলে গেচে অনেক আগে।

কর্মচারীটি তখন নিজের হিসেব মিলাচ্ছিলেন। সৈন্যটিকে দেখে বললেন, একটু বসো, আমি হাতের কাজটা সেরে তোমার মাইনা মিটিয়ে দিচ্ছি!

সৈন্যটি অগত্যা অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু একটু অপেক্ষা করেই বললো, আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারব না। আমার মাইনা মিটিয়ে দেওয়া হোক।

কর্মচারীটি মন দিয়ে টাকাপয়সার যোগ করছিলেন। সৈন্যটির কথায় যোগ সব গুলিয়ে গেল। মুখ তুলে বললেন, এত তাড়া দিচ্ছো কেন? নিজেই তো দেরি করে এলে? তোমার দলের লোকেরা কখন মাইনা নিয়ে চলে গেচে! একটু বসো তুমি!

না, বসবো না। এখুনি আমার মাইনা দিয়ে দাও।

মানে, যাকে বলে একেবারে মিলিটারী মেজাজ। মিলিটারী লোক তো!

কর্মচারীটি গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার হাতের কাজ না সেরে তোমার মাইনা দিতে পারবো না। তোমার যা ইচ্ছে করোগে যাও!

দেবে না মাইনা?—জোর করলো সৈন্যটি। কর্মচারীটি তেমনি জোর গলায় বললেন, আমি তো বলিনি মাইনা দেবো না, আমি বলেচি, একটু পরে দেবো।

না, এখুনি দিতে হবে।—বলেই হঠাৎ তলোয়ারটা কর্মচারীটির মুখের কাছে নিয়ে গেল সৈন্যটি। বললো, এখুনি মাইনা না দিলে এই তলোয়ার দিয়ে তোমার সামনের দু'টো দাঁত দেবো খুলে।

বটে!—কর্মচারীটি রেগে গেলেন: তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা!

আমাকে তলোয়ার দেখাচ্চো ? ঠিক আছে, তোমার মাইনা আমি চুকিয়ে দিচ্চি এখুনি, তবে মনে রেখো, তোমার ঐ তলোয়ারের খোঁচার চাইতে আমার এই কলমের জোর অনেক বেশি !

বলে কর্মচারীটি তাঁর কলমটিও সৈন্যের নাকের কাছে এগিয়ে ধরলেন।

সৈন্যটি এবার হেসে বললো, আচ্চা সে দেখা যাবে। এখন ভালো মানুষের মত মাইনাটা মিটিয়ে দাও তো ?

কর্মচারীটিও সৈন্যটির সঙ্গে আর বেশি কথা না বলে মাইনাটা মিটিয়ে দিলেন।

সৈন্যটি রূপেয়া গুণে নিয়ে, তলোয়ারটা খাপে ভ'রে যাবার সময় ঠাট্টা করে হেসে বললো, মুন্সীজী, যদি চাও তো আমাকে জানিয়ো—মাঠে গিয়ে তোমার কলম আর আমার তলোয়ার নিয়ে একবার লড়াই করা যাবে,—দেখা যাবে, কার খোঁচার জোর বেশি !

কর্মচারীটিও হেসে বললেন, সেজন্যে আর মাঠে যেতে হবে না, এখানেই সেটা পরখ করা যাবেখন। এখন তুমি যেতে পারো !

আচ্চা !—সৈন্যটি চলে গেল, বেশ বীরদর্পে।

পরের মাসে সৈন্যটি যখন আবার মাইনা নিতে এলো, তখন কর্মচারীটি গম্ভীর হয়ে তাঁর পাশের লোককে দেখিয়ে দিলেন।

ভাবটা, ওর কাছে থেকে মাইনা নাওগে।

সৈন্যটি পাশের লোকের কাছে গিয়ে মাইনা চাইলো।

লোকটি তখন খাতা খুলে যথারীতি সৈন্যটিকে জিগ্যেস করলো, তোমার নাম ?

নিজের নাম বললো সৈন্যটি।

তোমার বাপের নাম ?

তাও বললো সৈন্যটি।

তখন লোকটি জিগ্যেস করলো, তোমার গায়ের মার্কা কি?

অর্থাৎ তখন নিয়ম ছিল—ঠিক লোক কিনা তা জানবার জন্যে তার শরীরে কোন কাটা-ছেঁড়ার দাগ থাকলে সেটা খাতায় লিখে রাখা হতো। এখনও সে নিয়ম অনেক জায়গায় চালু আছে।

সৈন্যটি তা জানতো। এবং প্রতিমাসে যেমন দেখায় এমাসেও সে তার লড়াইয়ে অর্ধেক-কাটা বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা দেখালো।

না, না, এটাতো তোমার মার্কা নয়!—লোকটি মাথা নাড়ালো।

সৈন্যটি অবাক হয়ে বললো, কেন, আমার শরীরের এই দাগই তো আমি বরাবর দেখিয়ে আসচি।

উঁহু!—লোকটা খাতার দিকে নজর রেখে বললো, এতে লেখা আছে, তোমার সামনের দুটো দাঁত নেই।

দাঁত নেই?—আঁতকে উঠলো সৈন্যটি: এই তো আমার দাঁত!

দাঁত বার করে দেখালো সৈন্যটি।

লোকটি বেশ গম্ভীর হয়ে বললো, দাঁত দেখালে তো হবে না, দাঁত নেই তাই দেখাতে হবে। আর তা না দেখাতে পারলে তোমার ঐ তলোয়ার দিয়ে আমার মাথা কাটলেও মাইনা পাবে না। বরং কাজীর বিচারে তোমারই মাথাটি যাবে।

সৈন্যটি সব বুঝতে পারলো। বুঝলো, এই কাণ্ডটি ঐ রাজ-কর্মচারী করেচে। খাতায় তার মার্কা হিসাবে 'দুটো দাঁত নেই' লিখে রেখেচে।

আগেকার কর্মচারীটি চুপ করে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন।

সৈন্যটি এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে তাঁর পাশের লোকটিকে বললো এখন আমি কী করি ?

কী আর করবে ?—লোকটি বললো, আমার মাথা কাটার চাইতে বা তোমার মাথা কাটা যাওয়ার চাইতে আমার তো মনে হয় তোমার দাঁত তুটো যাওয়াই ভালো !

বেশ তবে তাই হোক।—সৈন্যটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো : বুঝলাম, তলোয়ারের খোঁচার চাইতে কলমের খোঁচারই জোর বেশি ! আর সেটা পরখ হয়ে গেল মাঠে নয়, এখানেই !—বলে সেই কর্মচারীটিকে বললো, আপনিই জিতলেন। সেলাম আপনাকে!

কর্মচারীটি যেন কিছুই শুনতে পাননি, হিসেব করতে লাগলেন।

সৈন্যটি আর দেরি না করে চলে গেল হেকিমের কাছে। সেখানে তার সামনের কাঁচা দাঁত তুটো তুলিয়ে রক্তাক্ত মুখ রুমালে চেপে দপ্তরে এলো মাইনা নিতে।

কর্মচারীটি তখনও হিসাব লিখছিলেন।

পশ্চিমের হাওয়া

সেবার কদিন পর পর ছুটি থাকায় ভাবলাম কাছাকাছি দেওঘরটা একবার ঘুরে আসি। হিল্লী-দিল্লী হয়েচে অথচ হাতের কাছে দেওঘরটা হয়নি। মানে, সময় হয়নি, খেয়ালও হয়নি। অথচ ভাড়াও এমন বেশি নয়। উপরন্তু ওখানে যাওয়া মানে পশ্চিমের হাওয়া খাওয়া আর তীর্থ করা দুই-ই হ'য়ে যায়—রথ দেখা কলা বেচার মতই।

তাছাড়া সেখানে থাকেন মার এক দূর সম্পর্কের কাকা—কাশীশ্বর খুড়ো। তাঁকে মা-ও কাশী খুড়ো বলতেন, আমরাও বলতাম। মানে, কাশী খুড়ো কোনদিন আর বুড়ো হয়ে দাদু হলেন না। ব্যাচেলার খুড়ো দেওঘরে বিঘে দু'তিন জমিতে বাড়ি করে দিব্যি হাত-পা মেলিয়ে থাকেন।

সেখানে গিয়ে উঠলাম আমি।

আমাকে দেখেই কাশী খুড়ো বললেন, এখন এলি ?

বললাম, হ্যাঁ, ট্রেনটা একটু লেট্ ছিল।

কাশী খুড়ো বললেন হেসে : ট্রেন তো লেট্ হয়েই থাকে। তবে you are also late—too late.

কেন ? কেন ?—অবাক হলাম খুড়োর কথায়।

কেন আবার ?—খুড়ো বললেন : সে-ই এলি পশ্চিমের হাওয়া খেতে—আর পঁচিশটা বছর আগে আসতে পারলিনে ?

শুনে হেসে বললাম, খুড়ো, তখন আমি এই ধরাধামেই আসিনি !

কাশী খুড়ো বললেন, যাক, এখন যখন এই অধমের ধামে এসে পড়েছিস—তখন যা পাস্ সেটুকুই লাভ মনে করিস। আয়, ভেতরে আয় !

বলে রাখি, কাশী খুড়োর বাড়ির নাম কিন্তু সত্যিই 'অধমের ধাম'।

মার কাছ থেকে আগেই শুনেছিলাম, কাশী খুড়ো বড্ড বেশি বকেন এবং বাজে বকেন। গিয়ে দেখি কথাটা হাড়ে হাড়ে সত্যি। আর উঠতে-বসতে হা-হুতাশ : এই, সে কালে ঐ ছিল---এ কালে সব গেল। মাথা খারাপ হ'য়ে যায় শুনতে-শুনতে। অথচ শুনতেই হয়। হোটেল-খরচা বাঁচাতে গেলে--Host-এর খেয়াল-খুশি মাফিক মাথা না নেড়ে উপায় নেই। দেওঘর থেকে ফেরবার আগের দিন খুড়ো আমার জন্যে স্পেশাল ডিশের ব্যবস্থা করলেন মুরগীর মাংস আর ভাত। দু'জনে খেতে বসেচি -খুড়ো জিগ্যেস করলেন, কেমন পশ্চিমে হাওয়া খেলি বল্?

এক গরস ভাত মুখে তুলে বললাম, ভালই।

ঘোড়ার ডিম!—খুড়ো বললেন, এখন এখানে সে হাওয়া আর আছে? না সে খাওয়া আর আছে? আগে ড্যাঙ্কি-বাবুরা এসে বাজারে আগুন লাগিয়ে গেচে আর এখন এ কালের কুবেরের দল এসে পশ্চিমী হাওয়াটাকে বিষিয়ে দিচ্চে।

শুনে অবাক হলাম : কী রকম?

কী রকম আবার?—খুড়ো বললেন দাঁত খিঁচিয়ে : দেখলিনে—আকাশে সব চিমনী আর ধোঁয়া! সব কারখানা হচ্চে! শিল্প হচ্চে! গুষ্টির মাথা হচ্চে! আরে বাবা, তোরা কি আর ইংরেজের মত industry গড়তে পারবি? সে জাতই আলাদা।

মুরগীর একটা ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বললাম, তা বটে!

নইলে, লোক যে খরচ করে পশ্চিমের হাওয়া খেতে আসতো —সাধে? শোন্ তবে বলি একটা ঘটনা। এই পশ্চিমের হাওয়ার গুণ কেমন শোন্—

বলুন!—বাটি থেকে খানিকটা মাংসের ঝোল ঢেলে নিলাম ভাতে।

কাশী খুড়ো দেখলেন, শ্রোতাটি বেশ মোসাহেবী-মার্কা। তাছাড়া এখন সে যে মৌখিক অবস্থায় আছে তাতে তার নাকে যদি কড়া গাঁজার ধোঁয়াও ছাড়া যায় সেটা তাকে গিলতেই হবে।

গিলতেই হ'লো।

কাশী খুড়ো বলতে লাগলেন, সে অনেক দিনের ব্যাপার। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এলো এখানে আমার দিদিমার খুব অসুখ। প্রায় শেষ অবস্থা। আমাকে দেখতে চায়।...চাইবেই তো। একমাত্র নাতি তার—খুব আদরের ছিলাম তো!

আমি কৌতূহলের ভাব দেখালাম : তা কি করলেন আপনি?

আর কি!—খুড়ো বললেন : তখুনি ছুটলাম কলকাতায়—ঐ যে, ঐ সাইকেলে—

সাইকেলে? এবার সত্যিই অবাক হ'তে হলো : কেন? তখন ট্রেন ছিল না?

কাশী খুড়ো উদাস হ'য়ে বললেন, ট্রেন? ছিল হয়তো। তবে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করবার সময় ছিল না। তাছাড়া ভেবে দেখলাম, ট্রেনে ঢিক-ঢিক করে যাওয়া মানে—অনেক সময় নষ্ট করা।

নষ্ট?—আমার খাওয়াও যেন নষ্ট হবার উপক্রম।

হ্যাঁ।—কাশী খুড়ো বললেন,—তাই সময় আর নষ্ট না করে—তখুনি বাঁই-বাঁই ক'রে বেরিয়ে পড়লাম বাই-সাইকেলে! একটুও কষ্ট হ'লো না। পশ্চিমের হাওয়ায় মানুষ তো!

তা তো বটেই।—বুঝলাম গাঁজায় দম দেওয়া হচ্চে। কাজেই আমিও দম্ ধরেই থাকলাম।

হ্যাঁ,—খুড়ো বললেন, জোর প্যাডেল ক'রে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে দেখি—দিদ্‌মার তখন প্রায় শেষ অবস্থা। ঘরভর্তি ডাক্তার আর আত্মীয়-স্বজন। সবার মুখ শুকনো—আমচুর! কেউ কেউ কাঁদচে। আর দেখলাম, দিদ্‌মাকে গ্যাস দেওয়া হচ্চে!

কী গ্যাস খুড়ো ?—একটু সজাগ করবার জন্যেই জিগ্যেস করলাম।

কী গ্যাস আবার ?—খুড়ো মোটেই অপ্রস্তুত না হ'য়ে বললেন, —ঐ যে—যে গ্যাসে রান্না হয়। রাস্তার আলো জ্বলে !

আমি মাথা নীচু ক'রে হাসি চেপে বললাম ঃ অ !

কাশী খুড়ো বলতে লাগলেন,—দিদ্‌মার অবস্থা দেখে আমারও যেন কান্না পেতে লাগলো। অথচ কিছুই করবার নেই। কী যে করা যায় !

এমন সময় বড় ডাক্তার যেন নিজের মনেই বললেন—To late, বড্ড দেরি হয়ে গেচে। এসব রোগীকে পশ্চিমে নিয়ে গিয়ে হাওয়া বদল করাতে পারলে—। But it is out of question—now !

How ?—আমি প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলাম। আমার মাথায় একটি বুদ্ধি ঝিলিক খেলে গেল। বললাম আমি ব্যবস্থা করচি।

Are you mad ?—বড় ডাক্তারের চোখ দুটো গোল হ'য়ে গেল ঃ এ রোগীকে এক ইঞ্চি সরাতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে expired হ'য়ে যাবে।

গম্ভীর হ'য়ে বললাম, বেশ সিকি ইঞ্চিও সরাতে হবে না। আপনি দেখুন—

বলেই ছুটে ঘরের বাইরে গেলাম। আমার ধুলোমাখা সাইকেলখানা নীচের বারান্দায় হেলানো ছিল—সেখানা টেনে হেঁচড়ে উপরে রোগীর ঘরে নিয়ে এলাম। তারপর একটা রবারের নলের জন্যে এদিক-ওদিক চাইতেই নজরে পড়লো—রবারের নল লাগানো ডুস্ একটি রয়েচে ঘরের কোণে। তাড়াতাড়ি সেই নলটার রবারের মুখটা আমার সাইকেলের চাকার ভ্যালভ্‌টা আলগা ক'রে জুড়ে দিলাম তাতে। তারপর হ্যাঁচকা টানে নাক থেকে গ্যাসের পাইপটা টেনে নিয়ে—সেই ডুসের নলটার কালো শক্ত মুখটা—ঐ যে নজল—না কি বলে—সেটি ঢুকিয়ে দিলাম তার নাকে।

নাকে ?—আমার হাতের ভাতের গরমও বুঝি নাকে ঢুকে যাবার জোগাড়।

হ্যাঁ, নাকে।—খুড়ো বললেন, এবং একটু পরেই সবাই দেখলো—দিদ্‌মা চোখ মেলে চাইচে! পরে আর একখানা চাকার হাওয়া খুলে আর নাকে দিতেই দিদ্‌মা স্রেফ চাঙা হ'য়ে বিছানায় উঠে বসে বললে,—ঘরে এত লোক কেন! কী হয়েচে ?

দিদ্‌মার নাক থেকে নলের কালো মুখটা খুলে নিয়ে বললাম, কিচ্ছু হয়নি দিদ্‌মা। এই দেখো আমি এয়েচি।

বেশ করেছিস দাদু—বেঁচে থাক। কখন এলি ?

বলেই দিদ্‌মা বললে, হ্যাঁরে, আমার নাকে কী একটা দুর্গন্ধ আসচে যেন!

ইস্!—শুনেই জিব কাটলাম মনে মনে : তাড়াতাড়িতে স্রেফ ভুল হ'য়ে গেচে তো! দিদ্‌মার নাকে দেবার আগে নলের মুখটা ধুয়ে নেওয়াই হয়নি।—হকচকিয়ে বললাম : ও কিছু নয় দিদ্‌মা।

এদিকে আমার ততক্ষণে দম ফাটবার অবস্থা! তবু নিজেকে সামলে নিয়ে জিগেস করলাম,—কিন্তু খুড়ো, একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হ'লো না!

কি ?

মানে,—আমতা-আমতা ক'রেই বললাম : সাইকেলের চাকার হাওয়ায় আপনার দিদ্‌মা চাঙা হ'য়ে উঠলেন কী করে ?

শুনে খুড়ো গম্ভীর হ'য়ে বললেন : আরে বোকা। ঐ চাকা দুটোতেই তো এই দেওঘরের পশ্চিমের হাওয়া ভরা ছিল।—আরো বললেন : হুঁ : তবু তো পশ্চিমের জল নিয়ে যেতে পারিনি। সে জল খাওয়াতে পারলে দিদ্‌মা হয়তো যৌবন ফিরে পেতো!

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার হঠাৎ বিষম লেগে গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম আসন থেকে।

দরওয়াজা খোল্ দে

অনেকদিন আগেকার কথা।

ভারতে তখন ইংরেজের রাজত্ব। ইংল্যাণ্ড থেকে নতুন নতুন ইংরেজ আসে—ভারত শাসনের কাজ নিয়ে। এসে প্রথম প্রথম অসুবিধায় পড়ে এদেশের আচার-ব্যবহার জানা না থাকায়।

তবে ক'দিনের মধ্যেই এদেশে থাকা অন্যান্য ইংরেজরা নতুনদের সব বুঝিয়ে দেয়, তাদের চালাক ক'রে তোলে।

ভাল করে বুঝিয়ে দেয়, আমরা রাজার জাত, আর এদেশী এরা সব প্রজা—নেটিভ। এদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশবে না, মান রেখে চলবে। লাল মুখকে এরা ভয় করে, শ্রদ্ধা করে, খাতির করে—আর তোমার সঙ্গেও যাতে তাই করে, সেদিকে রাখবে কড়া নজর।

আরো ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেয়—এদের সঙ্গে আমাদের চাকর আর প্রভুর সম্বন্ধ।

সাহেবী-ক্লাবে বা অফিসে এসব উপদেশ মন দিয়ে শোনে নতুন-আসা সাহেবরা এবং দু'দিনেই তাদের আচরণ রপ্ত ক'রে ফেলে। থাকে রাজার হালে। আর তাদের থাকে বিরাট বাড়ি, গাড়ি, ডজন খানেক আয়া, আর্দালি, বোয়, বাবুর্চি।

কথায় কথায় তাদের তখন বোল্ বেরোয়ঃ ড্যাম---ব্লাডি---সোয়াইন্।

আচরণে ফুটে বেরোয় দম্ভ আর অহংকার।

ধরাকে সরাজ্ঞান করতে থাকে। এদেশের মানুষকে মানুষ বলেই মনে করে না।

অথচ—

অথচ এই ইংরেজকে তাদের 'হোম'-এ মানে ইংল্যাণ্ডে দেখলে চিনতেই পারা যাবে না। এই সাহেবই নিজের দেশে নিজের হাতে

কাজ করেচে, কাপ-ডিস ধুয়েচে, পোশাক কেচেচে, ঘর পরিষ্কার করেচে, নিজে রান্না করেও খেয়েচে।

তাছাড়া লোকের সঙ্গে কত ভদ্র ব্যবহার করেচে। এমন কি, এদেশী কেউ ওদেশে গেলে তাকেও অভ্যর্থনা করেচে: Come in please.

অর্থাৎ গেরস্থ বাড়ির বেড়াল যেমন বনে গেলে বনবেড়াল হয়, এই সব 'হোম'-এর সাধারণ সাহেবরাও তেমন ভারতবর্ষে এলে 'নবাব' হ'য়ে উঠতো।

যাক, এবার এক সাহেবের ঘটনা বলি।

একবার মিঃ জেম্‌স হাওয়ার্ড নামে এক ইংরেজ এলেন ভারতবর্ষে—বেশ একটা বড় চাকরি নিয়ে।

সাহেবের বয়েস বেশি নয়। এই, সাতাশ-আটাশ হবে। খুব ঢ্যাঙা। চোখ দুটো নীল। লাল মুখটা লম্বাটে। চুলগুলো সোনালী। নাকটা একটু উপর দিকে উঁচু করা। সাহেব বিয়ে করেননি। একলাই এসেচেন এদেশে।

বাংলাদেশে জেম্‌স সাহেব এলেন—কিন্তু বাংলা একদম তো বোঝেনই না, হিন্দীও বোঝেন না।

সাহেব তাঁর বাংলোতে বোয়-খানসামাদের যা বলেন, তারাও তাঁর কথা বোঝে না।

মহামুস্কিল।

আর, সাহেবের মুখে যা জড়ানো ইংরেজি বুলি তা বেয়ারা-খানসামাদের বোঝাও সাধ্য নয়।

তাই মজার মজার ব্যাপার সব ঘটতে লাগলো। জেম্‌স সাহেব বারান্দায় চেয়ার আনতে বললে, বেয়ারা চা এনে হাজির করে; জুতো আনতে বললে জ্যাম-জেলি নিয়ে সামনে ধরে।

সাহেব সবে ভারতবর্ষে পা দিয়েচেন। কাজেই মেজাজটা

তখনো পর্যন্ত নরম। এবং সেইজন্যেই বোয়-বেয়ারা-খানসামাদের কাণ্ড দেখে হেসে ফেলেন, গরম হন না বড়ো। শেষে নিজেই নিজের কাজটা ক'রে নেন।

একদিন জেম্‌স সাহেবের কাছে বেড়াতে এসেচেন আলফ্রেড সাহেব। আলফ্রেড অনেকদিন থেকেই ভারতবর্ষে আছেন, হিন্দী ভালই বলতে পারেন, বাংলাও বলেন ভেবে ভেবে আর থেমে-থেমে।

আলফ্রেড সাহেব এসেই বললেন,—মিঃ হাওয়ার্ড, এক গ্লাস জল দিতে বলো না তোমার বেয়ারাকে! গলাটা বড় শুকিয়ে গেচে। এদেশটা বড গরম কিনা—

জেম্‌স বললেন, কেন, একটু বিয়ার বা ব্রাণ্ডি খাবে?

না। আলফ্রেড বললেনঃ এসব গরমের দেশে ওসব জিনিস সব সময়ে চলে না। এখানে জলের কাছে আর কিছু নয়।

তখন জেম্‌স ডাকলেন—বোয়।

একজন বেয়ারা এসে হাজির হতেই জেম্‌স বললেন,—ওয়াটার

বেয়ারা তখন চলে গেল এবং একটু পরে দেখা গেল সে একটা প্লেটে খানিকটা মাখন নিয়ে উপস্থিত।

দেখে দুই সাহেবই তো হেসে অস্থির। তবে একটু পরেই আলফ্রেড সাহেব ধমকে উঠলেন, ইউ ব্লাডি ফুল! হাম পানি মাংটা হ্যায়,—ওয়াটার! বাটার নেহি!

বেয়ারা তাড়াতাড়ি এবার জল আনতে গেল। আলফ্রেড জেম্‌সকে বললেন,—লোকটা তোমার 'ওয়াটার' কথাটাকে 'বাটার' ভেবেচে। তোমার জড়ানো ইংরেজি বুঝতে পারেনি।

একটু পরেই বেয়ারা একটা প্লেটের উপর এক গেলাস জল ঢাকনা ঢাকা দিয়ে এনে সাহেবকে দিল। আলফ্রেড জল খেয়ে গেলাস ফেরত দিলেন বেয়ারাকে।

বেয়ারা চলে গেল।

তখন জেম্‌স সাহেব বললেন, দেখো, আমি বড়ই মুস্কিলে পড়েচি। এরা কেউ আমার কথা বোঝে না।

আলফ্রেড বললেন,—বুঝবে'খন আস্তে আস্তে। আর তুমিও বুঝতে পারবে—বলতেও পারবে এদের কথা। এই তো সবে এলে!

জেম্‌স তাঁর দুঃখের কথা বলতে লাগলেন: কাল রাত্রে এক মজার ঘটনা হয়েছিল!

কি?

আমি ক্লাব থেকে ফিরে হাজার ডাকাডাকি করচি, তবু দরজা আর খোলে না। মহা বিপদ! পরে দরজায় অনেক ধাক্কা-ধাক্কির পর দরজা খুললো!

তাই নাকি? হয়তো ঘুমুচ্ছিল। সে রকম দেখলে চাবকে ঠাণ্ডা করে দিও।

না, না ঘুমোচ্ছিল না। জেম্‌স বললেন, হয়তো আমার কথা বুঝতে পারেনি। যাক তুমি আমাকে একটু হিন্দী বা বাংলা শিখিয়ে দাও। নইলে ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে।

না, না।—আলফ্রেড বললেন, এ তো আমাদেরই রাজত্ব। কোন্ দুঃখে ফিরে যাবে হোম-এ। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো এদের ভাষা! তবে তার আগে দরজা খোলাতে আর যাতে না বেগ পাও তার ব্যবস্থা করচি।

কি রকম?—জেম্‌স উৎসুক হলেন শুনতে। আলফ্রেড তখন জেম্‌সের কানে কানে কী যেন বললেন। বলতেই জেম্‌স হো হো হেসে উঠে বললেন,—ইজ ইট? তাই নাকি? আলফ্রেড হেসে বললেন, আচ্ছা তোমাকে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিচ্ছি। বলেই ডাকলেন বোয়!

বেয়ারা ডাক শুনে আসতেই তাকে সামনের ঘরের বন্ধ দরজাটি দেখিয়ে আলফ্রেড বললেন, দেয়ার ওয়াজ এ কোল্ড ডে!

জী সা'ব।—বলেই বেয়ারাটি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সামনের দরজাটা খুলে দিলো!

চমৎকার!—জেম্‌স হো হো করে হেসে আলফ্রেডের হাত দুটো ধরলেন: ওয়াণ্ডারফুল। থ্যাংকু মাই ফ্রেণ্ড!

আলফ্রেড বুঝিয়ে দিলেন, ওতেই লোকটি বুঝলো—দরওয়াজা খোল্ দে!

বলেই দুজনের আবার হাসি।

কিন্তু বেয়ারাটা বুঝলো না দরজাটা খুলতেই সাহেব দু'জন অত হাসচে কেন?

সঙ্গীতের মৃত্যু

তখন দিল্লীর সিংহাসনে নতুন বাদশা হয়েছেন ঔরংজেব।

তিনি গান-বাজনা পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে ও-সব ছিল ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। অথচ তখন দিল্লীতে গান-বাজনার রেওয়াজও খুব ছিল। অনেকেই গান-বাজনা করতেন আর অনেকেই ছিলেন সঙ্গীতরসিক।

বাদশা ঔরংজেব হুকুম দিলেন, রাজ্যে গান বাজনা করা চলবে না। আর যাতে না চলে তা দেখবার জন্যে রাজকর্মচারীও নিযুক্ত করলেন। কোথাও গান-বাজনা হচ্চে দেখলেই তারা সেখানে ছুটে যেতো এবং সভা ভঙ্গ তো করে দিতোই, বাদ্যযন্ত্র-গুলোও ভেঙে চুরমার করে দিতো। পদ্মবনে যেন মত্তহাতী ঢকতো।

গাইয়ে-বাজিয়েরা দেখলেন, এ তো বড় মুস্কিল। রসসৃষ্টি করা তো বন্ধ হলোই, সেই সঙ্গে তাঁদের রুজি-রোজগারও যে বন্ধ হইতে চললো। গান গেয়ে বা বাজনা শুনিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার হচ্ছিল, এখন বাদশার হুকুমে না খেয়ে মরতে হবে যে!

দিল্লী শহরের সব গাইয়ে-বাজিয়েরা একদিন গোপনে এক জায়গায় মিলিত হলেন এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন: কী ভাবে এর প্রতিকার করা যায়! একটা কিছু তো করা দরকার; নইলে প্রাণে মরতে হবে যে!

শেষে তাঁরা একটা উপায় ঠিক করলেন। সবাই জানতেন, বাদশা ঔরংজেব প্রতি শুক্রবার অর্থাৎ জুম্মাবারে মসজিদে নামাজ পড়তে যান। প্রাসাদদুর্গ থেকে যে পথে তিনি হাতীতে চেপে মসজিদে নামাজ পড়তে যান সেই পথের দুধারে প্রায় হাজার খানেক গাইয়ে-বাজিয়ে এক শুক্রবারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে 'হায় হায়' করে বিলাপ করতে শুরু করলেন।

আর কয়েকজন গাইয়ে-বাজিয়েরা একটা খাটে ভাঙা বাদ্যযন্ত্র সাজিয়ে নিয়ে কাঁধে করে সেই রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন। যেমন কোন লোক মরে গেলে খাটে করে নিয়ে যায় তেমনি!

বাদশা ঔরংজেব যথারীতি নমাজ পড়বার জন্যে হাতির পিঠে চেপে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন। দেখলেন, রাস্তায় খুব ভিড়। আর বাদশাকে দেখে রাস্তার দু' ধারের গাইয়ে-বাজিয়েদের 'হায় হায়' কান্না আরও বেড়ে গেল।

বাদশা তাঁর হাতি থামিয়ে পার্শ্বচরদের একজনকে জিগোস করলেন, কি ব্যাপার?

পার্শ্বচরটি খবর নিয়ে এসে বললেন, শাহানশা, গোস্তাকি মাফ হয়। ওরা সব গাইয়ে-বাজিয়ে। আর ঐ খাটে রয়েচে ভাঙা বাদ্যযন্ত্র। ওটাকে ওরা ঘটা করে কবর দিতে যাচ্চে।

শুনে ঔরংজেব বুঝলেন ব্যাপারটা কি! তাঁর হুকুমের প্রতিবাদে ঐ সব গাইয়ে-বাজিয়েরা তাঁকে দেখাবার জন্যে ঐ ব্যবস্থা করেচে।

তিনি মুচকে হাসলেন একবার, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, সত্যিই তো, কাঁদবারই কথা। তবে যে মারা গেচে তাকে তো আর বাঁচানো যাবে না। যাতে মহা সমারোহে সসম্মানে তার কবর দেওয়া হয় সেদিকে যেন লক্ষ্য রাখা হয়। ওঁদের বলে দাও সে কথা!

বলেই ঔরংজেব হুকুম দিলেন মাহুতকে—চালাও হাতি।

ভেট

হরিপদবাবু কনট্রাক্টর।

সরকারী অফিসের কাজে গাড়ি-গাড়ি ইট-চুন-সুরকি সাপ্লাই করেন। ভারি-ভারি বিল করেন আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ভরেন সিন্দুকে।

নিন্দুকে অবশ্য অনেক কিছুই বলে। তা বলুক। তাদের চোখ টাটায়, তাই বোধহয় যা-তা ব'লে গগন ফাটায়।

কিন্তু আমাদের পাড়ার কাছেই তো থাকেন ভদ্রলোক। কই, বেশ তো আমুদে, বেশভূষায় চাল নেই, কথায় বেচালপনা নেই। ছোটদের 'ভাই' বলেন, বড়োদের বলেন 'দাদা'।

তাছাড়া ক্লাবে চাঁদা দেন, ভিখিরিকেও ভিক্ষে দেন, বিপদে পড়লে পরামর্শ দেন। একটা ভদ্রলোকের কাছ থেকে আজকালকার দিনে এর চাইতে আর বেশি কি আশা করা যায়?

আমি কোনো দোষ দেখিনে হরিপদবাবুর।

কাজের জন্যে বাইরে থাকি আমি। শেষ দেখা হয়েছিল হরিপদবাবুর সঙ্গে প্রায় আট-দশ বছর আগে। দেখা হয়েছিল নিউ মার্কেটে। শীতকালে। হরিপদবাবু পেছনে ঝাঁকামুটে নিয়ে বাজার করছিলেন, ঝাঁকায় নানা জিনিস। বড় বড় বাঁধাকপি, ফুলকপি, কড়াইশুটি, টমেটো, কমলালেবু, গোটা চারেক মুরগী, একটা বিরাট রুই মৎস্য।

ব্যাপার কি? যাবো নাকি?—হেসে বলেছিলাম।

হরিপদবাবু তেমনিই হেসে উত্তর দিয়েছিলেন: আর ভাই, তোমাদের পায়ের ধুলো পড়বে আমার বাড়িতে, সে সৌভাগ্য কি আর করেচি?

তবে এসব কি উপলক্ষ্যে ?

আবার হাসলেন হরিপদবাবু : আর বলো না ভাই, ঘুস।

ঘুস !

ঐ যাকে বলে—ডালা, ভেট। এক বোতল দামী মদও কিনতে হবে। পাঠাতে হবে বড় সাহেবের বাড়ি। একেই বলে বড়দিন !

তারপর বহুদিন দেখা হয়নি হরিপদবাবুর সঙ্গে।

বহুদিন কেন, বহু বছর।

ভারত হয়েচে স্বাধীন। অনেক কিছুর হয়েচে অদল-বদল। কালের রথ চলচে ঘর্ঘর ক'রে। সবাই তার পেছনে ছুটচে ধর-ধর্ বলে। কেউ পারচে পাল্লা দিয়ে ছুটতে, কেউ পড়চে পিছিয়ে। ঐ রথের চাকায় ধাক্কা লেগে কেউ বা পড়চে চাপা, মিলিয়ে যাচ্চে এ সংসার থেকে, আবার কেউ বা পড়চে ছিটকে এখানে-ওখানে।

আমি ছিটকে পড়েছিলাম মফঃস্বলের এক শহরে।

সেদিন কলকাতায় এসে দেখা হয়ে গেল হরিপদবাবুর সঙ্গে। আশ্চর্য, সেই নিউ মার্কেটেই। গরম কালে।

এবারও দেখি হরিপদবাবু বাজার করতে ব্যস্ত। তবে পেছনে ঝাঁকামুটে নয়। কাঁধে এক ঝুলি নিয়ে।

বললাম, অনেকদিন পরে দেখা। সেই শেষ দেখা হয়েছিল এই নিউ মার্কেটে। আবার আজ এখানেই দেখা হ'লো।

হরিপদবাবু হাসলেন : আর বলো কেন ভাই, নিউ মার্কেটই আমার বাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েচে। তা' সব খবর ভালো তো ? কবে এলে ?

বললাম, এসেচি দু-চারদিন হ'লো। আপনার খবর ভালো তো ?

আর ভালো ! এই দেখো না কাঁধে ঝোলা বয়ে বেড়াচ্ছি।

হেসে বললাম : তা ঝোলাটা তো বেশ ফুলে উঠেচে। কি কিনেচেন এতো ?

আর বলো কেন ? স্নো, সাবান, পাউডার, সেন্ট, কেক, চকোলেট ইত্যাদি।

হেসে বললাম : কার ? বৌদির জন্যে বুঝি ?

হরিপদবাবু বললেন, বৌদি তো তোমার বুড়ি হ'য়ে গেচেন। এসব আমার দিদিমণির জন্যে।

মানে ?—সত্যিই বুঝিনি তাঁর কথাটা।

মানে, ঘুস।

ঘুস !

হরিবাবু মুচকে হেসে বললেন, অফিসে বিল পাশ করেন যে দিদিমণিটি তাঁর ওখানে পাঠাতে হবে। কালকে পয়লা বোশেখ জানা নেই ? নববর্ষের উপহার।

স্ক্রু-ড্রাইভার, করাত আর হাতুড়ি

আমি ছোটবেলা থেকে মামাবাড়িতেই মানুষ।

চার বছর বয়সে মা মারা যাবার পর মামাই বাবাকে বলে তাঁর কাছে এনেছিলেন আমাকে মানুষ করবার জন্যে। মামার কোনো ছেলে ছিল না, কাজেই আমিই মামা-মামীমার কাছে তাঁদের ছেলের মতই মানুষ হতে লাগলাম, লেখাপড়া শিখতে লাগলাম।

অবশ্য মামার একটি মেয়ে ছিল। আমার চাইতে বয়সে অনেক বড়। তাকে আমি মণিদি বলে ডাকতাম। ভাল নাম ছিল মণিমালা।

মণিদির একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

বেশ ঘটা করেই বিয়ে হলো। তবে বিয়ে হলো কলকাতার বাইরে অনেক দূরে—সেই মালদা-য়। জামাইবাবু, শুনলাম, সেখানে গভর্নমেণ্ট অফিসে কী যেন কাজ করেন। ভাল কাজ করেন। নিজের কোয়ার্টার তো আছেই, জীপ-গাড়ি আছে, আর কলকাতার মত লোকজনের অভাব নেই।

মণিদি আমাকে খুব ভালবাসতো। মণিদির সঙ্গে বাজারে বেরুলেই মণিদি আমাকে টফি-লজেঞ্জ কিনে দিতো। দুজনে কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে পেটভরে খেয়ে আসতাম। আর জন্মদিনে প্রত্যেক বছরে মণিদি আমাকে মোটা-মোটা ছবিওলা গল্পের বই কিনে দিতো।

এই মণিদির যখন বাইরে বিয়ের ঠিক হলো, তখন মামীমা একটু আপত্তি জানিয়েছিলেন। একটি মাত্র মেয়ে চোখের সামনে থাকবে না, ইচ্ছে করলে তাকে আনানো বা গিয়ে দেখে আসা এসব চলবে না, এ যেন কেমন হবে।

মামা বললেন, কিন্তু সম্বন্ধটা ভাল। চাকরিতে উন্নতি আছে। আর খবর নিয়ে দেখেচেন ছেলেটিও ভাল।

কাজেই মামীমাকেও রাজী হতে হলো।

বাইরে বিয়ে হওয়ায় আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। আর মণিদিকে আমার হাতের কাছে পাওয়া যাবে না, আর আমার হাতে এটা-ওটা তুলে দেবারও কেউ থাকলো না।

বিয়ের কদিন আগে মণিদিকে মনের কথাটা বলেই ফেললাম: মণিদি, তুমি চলে যাচ্চো, আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেচে।

হেসে মণিদি বললো, কেন রে?

বা রে!--মাথা নীচু করে বললাম, আমি তোমার সঙ্গে আর বাজারে যেতে পারবো না। আর --

আর কেউ তোকে লজেঞ্জ-টফি কিনে দেবে না? তাই তো? মণিদি আমার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিলো।

মণিদি আমার মনের কথাটা ঠিক ধরতে পেরেচে জেনে মনে মনে খুশি হয়েই ঘাড় নাড়ালাম।—মানে, ঠিক ধরেচো মণিদি।

মনিদি আবার হেসে বললো, দূর বোকা, সেজন্যে তুই ভাবচিস কেন? ঐ যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্চে না—শুনলাম, সে ভদ্রলোকের নাকি জীপ-গাড়ি আছে, আর জানিস, মালদায় নাকি খুব ভাল ভাল আম পাওয়া যায়। আর কাছেই গৌড় বলে একটা জায়গা আছে—বাংলা দেশের পুরোন রাজধানী, সেখানে অনেক কিছু দেখবার আছে। তাছাড়া ঐ ভদ্রলোক, মানে তোর জামাইবাবুবে, মাসে মাসে কলকাতায় আসেন নাকি অফিসের কাজে—সেই সময় বলে দেবো তোকে নিয়ে যেতে। মানে আমের সময়। খুব আম খাওয়া যাবে আর জীপে করে বেড়ানো যাবে। কী মজা হবে, তাই না?

ভেবে দেখলাম, কথাটা মন্দ নয়। বেশ একটু নতুন

ধরনের মজাই হবে। তাছাড়া কলকাতার এই ট্রাম-বাসে ঝুলে-ঝুলে হাতিবাগান, কলেজ স্ট্রীট, নিউ মার্কেট, অনেক তো ঘোরা গেচে—এবার বেশ নতুন মজাই করা যাবে।

কাজেই আমিও মণিদি-র এই বিয়েতে শেষপর্যন্ত খুশিই হলাম। আর সেজন্যে বিয়েতে খুব খাটলামও। বিয়ের দিন লোকজন খাওয়াবার সময় আমি জলের জগ হাতে সবাইকে যেচে যেচে জল দিলাম, নুন দিলাম, লেবু দিলাম। একটা ব্যাচে লুচিও পরিবেশন করেছিলাম। হ্যাঁ, মাছ মাংস, দই মিষ্টিও পরিবেশন করতে পারতাম, কিন্তু বড়রা আমাকে সাহস করে ঐসব দিলেন না করতে। ঐ এক মুস্কিল। বড়রা চট্ করে ছোটদের বিশ্বাস করতে পারেন না। কিন্তু ছোটরা কী না পারে করতে। এমন অনেক কিছু করতে পারে, যা বড়রা করতেই পারেন না।

যাক, আমি ভবিষ্যতে মালদায় বেড়াতে যাবার পথটা সুগম করে রাখবার জন্যে জামাইবাবুর সঙ্গে রীতিমত ভাব জমিয়ে ফেললাম। বাসর ঘরে অনেকে জামাইবাবুকে বিরক্ত করচে দেখে আমিই জামাইবাবুর পক্ষ হয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলাম। আর সর্বক্ষণ আমি জামাইবাবুর সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরতে লাগলাম।

তা মণিদির প্ল্যান ঠিক মতই লেগে গেছলো। আর আমারও এত চেষ্টা বৃথা যায়নি। আমের সময় মণিদি মামা-মামীকে চিঠি লিখলো, তোমাদের জামাইয়ের কলকাতা যাওয়ার এখন ঠিক নেই। তবে একজন পিয়ন কলকাতার অফিসে কাজের জন্যে যাচ্চে। তার হাতেই এই চিঠি দিলাম। সে দু'একদিনের মধ্যে ফিরবে। তুমি ওর সঙ্গে শানুকে (আমার নাম। ভাল নাম? শান্তনু) পাঠিয়ে দিয়ো। আম খেয়ে যাবে আর বেড়িয়ে যাবে।

ব্যস! পারমিশন পাওয়া গেল।

আর তখন গরমের ছুটি থাকায় স্কুলও বন্ধ। অতএব প্রায় পনেরো-কুড়িদিন মালদায় মণিদি আর জামাইবাবুর সঙ্গে গৌড় দেখলাম, আরো অনেক জায়গায় বেড়ালাম, আর শুধু আম আর আম খাওয়া। সে সব আমের কত রকম নাম। কত রকম দেখতে! আর কি মিষ্টি! যেন গুড়!

তারপর ফিরে এলাম কলকাতায়। আর কী মজা! সঙ্গে এলো মণিদি। সেই সঙ্গে ঝুড়ি ভর্তি আম মামা-মামীদের জন্যে। জামাইবাবু সঙ্গে আসতে পারলেন না। তাই অফিসের একজন লোককে দিলেন সঙ্গে।

মণিদির ছেলে-পুলে হবে বলেই মণিদি আমার সঙ্গে কলকাতায় এলো। মামাই চিঠি দিয়েছিলেন, আসবার জন্যে। ওখানে মণিদি একলা, তার শ্বশুর শাশুড়ীও কলকাতায়। কাজেই এসময় মণিদির কলকাতায় আসাই ভাল। তাছাড়া, কী মজা! শুনলাম, আমাদের এখানেই থাকবে, এখানেই নাকি তার ছেলে-পুলে হবে। কাজেই বেশ কিছুদিন থাকতে হবে মণিদিকে।

আবার মণিদি আর আমি বাজারে বেরুতে লাগলাম। তবে আগের মত অত ঘন ঘন নয়। মাঝে-মাঝে। তা হোক, মণিদির হাতে তো এবার অনেক টাকা। নিজের টাকা। জামাইবাবু নাকি দিয়েচে সঙ্গে। কাজেই এবার আর টফি-লজেঞ্জ বা বই নয়। ফাউন্টেন পেন, ভাল ব্যাগ, এমন কি একটা বক্স ক্যামেরা পর্যন্ত হাতে এসে গেল।

হেসে বললাম, মণিদি, মালদায় গিয়ে তোমার মাল-পত্তর দেওয়ার হাত খুব বেড়ে গেচে দেখচি।

শুনে মণিদি হেসে বললো, তুই বলতে চাস, যেমন জ্ঞানদা, মোক্ষদা জ্ঞান দেন, মোক্ষ দেন--তেমনি আমি মালদা হয়ে গেচি?

তার কথায় মামা-মামীরাও হেসে উঠলো।

কিছুদিন পরে মণিদির জন্যে আমার ভাবনা হতে লাগলো। কারণ, মণিদির জন্যে প্রায়ই আমাদের ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে হতো। ডাক্তার চ্যাটার্জি আসতেন, মণিদিকে পরীক্ষা করতেন ঘরের দরজা বন্ধ করে, আর আমরা মুখ চুন করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

খানিকবাদে ডাক্তারবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলতেন, না, এখনও কিছুদিন দেরি আছে!

শুনে মামা-মামীরা খুশি হতেন কিনা জানিনে, তবে আমি খুশিই হতাম। যাক, মণিদি আরো কিছুদিন হয়তো বাইরে বেড়াতে যেতে পারবে।

কিছুদিন বাদে দেখি জামাইবাবুও এলেন।

শুনলাম, মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেচেন।

জামাইবাবু তাঁদের নিজেদের বাড়িতেই উঠলেন। তবে বেশির ভাগ সময়ই থাকতেন আমাদের বাড়িতে। কিন্তু মণিদির বেড়াতে যাওয়াটা গেল কমে।

একদিন রাত্রে ঘুমোচ্চি, মামীমা এসে আমাকে ঠেলা দিয়ে ডেকে তুললেন, এই শান্তু, শীগ্‌গীর একবার ডাক্তার চ্যাটার্জিকে ডেকে আন তো?

তাড়াতাড়ি চোখ রগড়াতে-রগড়াতে ছুটলাম ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। আর কী ভাগ্যি, জামাইবাবু সেদিন আমাদের বাড়িতেই ছিলেন।

ডাক্তারবাবু খবর পেয়ে গাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গেই চলে এলেন। আমি তাঁর ব্যাগটি হাতে করে নিয়ে এলাম।

ডাক্তারবাবু মামা-মামীমা আর জামাইবাবুর সঙ্গে কী সব

কথাবার্তা বলে আমার হাত থেকে ব্যাগটি নিয়ে মণিদির ঘরে ঢুকে দরজাটি ভেজিয়ে দিলেন। তবে বললেন, আমি নার্সকে ফোন করে দিয়েছি, এখুনি আসবে, এলে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

আচ্ছা।—আমরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এবার যেন সকলের মুখ বেশি শুকনো।

সবাই হয়তো মনে মনে রাম নাম বা দুর্গা নাম জপতে লাগলাম, আমি মনে মনে হ্যানিম্যান-এর নাম জপ করতে লাগলাম: হে হ্যানিম্যান সাহেব! আপনি আমার মণিদিকে ভাল করে দিন।

কারণ ক'দিন আগেই আমি পড়েছিলাম, হ্যানিম্যান খুব বড় ডাক্তার।

এমন সময় ডাক্তারবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। শুধু বললেন, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার দিন তো?

স্ক্রু-ড্রাইভার! সবাই আঁৎকে উঠলো। কিন্তু আমার হয়তো আৎকাবার সময় ছিল না। ছুটে গিয়ে আমার যন্ত্রপাতির ব্যাগ থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার এনে ডাক্তারবাবুর হাতে এগিয়ে দিলাম।

ধন্যবাদ—থ্যাংস!—ডাক্তারবাবু আবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। স্ক্রু-ড্রাইভার কি হবে? এতক্ষণে আমারও।

হঠাৎ আবার বেরিয়ে এলেন ডাক্তারবাবু। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, করাত আছে? করাত? হাত-করাত?

আছে বোধ হয়।—ঢোক গিলে বললাম।

আনো শীগ্‌গীর।

আবার ছুটলাম। হ্যাঁ, পাওয়া গেল করাতখানা। এনে দিলাম তাঁর হাতে।

আবার ঢুকে গেলেন ঘরে। ভেজিয়ে দিলেন দরজা।

এবার মাটিতে বসে পড়লেন মামীমা। মামা বারান্দাময় পায়চারি করতে লাগলেন। জামাইবাবু মাটির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগলো। আমি জামাইবাবুর গা ঘেঁষে তাঁর হাতটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মামীমার কথা হঠাৎ কানে এলো। ফিসফিসে কথা। মামাকে জিগেস করলেন, ওসব কি হবে? হ্যাঁ গো?

জানিনে।—মামার গম্ভীর উত্তর।

ভিতরে যাবো একবার?

জানিনে।

এমন সময় ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হয়ে আবার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। গম্ভীর হয়ে বললেন, একটা হাতুড়ি চাই। তাড়াতাড়ি।

হাতুড়ি! আমাদের সকলের মাথায় তিনি যেন হাতুড়ির ঘা মারলেন।

মামীমা এবার উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন,—না, না ডাক্তারবাবু, হাতুড়ি নয়।

শুনে বিরক্ত হলেন ডাক্তারবাবু। ধমক দিলেন মামীমাকে: এখন চুপ করুন তো! একে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আর আপনি মাথা খারাপ করবেন না।—বলেই আমাকে বললেন, যাও তো শান্তু, একটা হাতুড়ি এনে দাও। দেরি করো না।

আমি আবার ছুটে গিয়ে হাতুড়ি এনে দিলাম।

শুনলাম, মামীমা বলছেন, আমি একবার ঢুকবো ঘরে?

ডাক্তারবাবু বললেন, না।

ডাক্তারবাবু আমার হাত থেকে হাতুড়িটা নিতেই মামীমা এবার তাঁর হাতুড়ি সমেত হাতটা চেপে ধরলেন,—না, ডাক্তারবাবু, হাতুড়ি মারবেন না, আপনার পায়ে ধরি।

বলেই হুড়মুড় করে ডাক্তারবাবুকে প্রায় ঠেলে নিয়ে মামীমা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সেই সঙ্গে আমরাও।

গিয়ে দেখি, মণিদি বিছানায় শুয়ে আছে। মুখটা তার কাচুমাচু, বোধহয় যন্ত্রণায়।

মামীমা মণিদির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, কী হয়েচে রে, কী হয়েচে ?

উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু। বেশ রাগ করেই : কী আবার হবে ? তাড়াতাড়ি ব্যাগের চাবিটা ফেলে এসেচি। তাই এতক্ষণ গা তালাটা ভাঙার চেষ্টা করছিলাম। তা হলে আপনারা যা ইচ্ছে করুন, আমি যাই—

না ডাক্তারবাবু।—আমি ঘরের দরজায় পথ আটকে দাঁড়িয়ে বললাম,- -আপনি মারুন হাতুড়ি, যত ইচ্ছে।